সাম্পান

নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা

SAAMPAAN

New Alipore College Magazine

2017-2018

OLD IS GOLD
HERITAGE UNIVERSITIES AROUND THE WORLD

University of Al-Karaouine: Located in Fes, Morocco and founded in 859 by Fatima al-Fihri, it has developed into one of the leading universities for natural sciences.

Al-Azhar University: Founded in 972 AD in Cairo (Egypt), this University is the world's second oldest surviving university serving as a centre for Arabic literature and Sunni Islamic learning.

University of Bologna: Founded in 1088 in Italy, it has a diverse range of programmes at all levels.

University of Paris: Founded in 1150 in Paris (France), it is often known as 'la Sorbonne'.

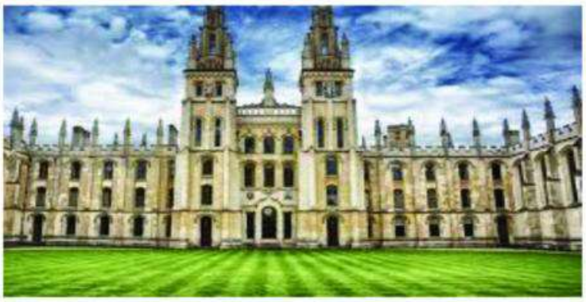

University of Oxford: Established in 1096 in UK, it has always held a pioneering place in academic world.

University of Cambridge: Established in 1209 in UK, it is ranked as one of the world's top five universities and is a premier university in the world.

University of Salamanca: Established in 1218 in Salamanca (Spain), it obtained the title of 'university' through Alexander IV's papal bull in 1225.

University of Padua: Founded in 1222 in Italy, it is notable for its revolutionary early research in astronomy, law, medicine and philosophy.

Courtesy: Department of Education

সাম্পান

নিউ আলিপুর কলেজ

পত্রিকা

২০১৭ - ২০১৮

ব্লক - এল, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩
ফোন ঃ ০৩৩ ২৪০৭ ১৮২৮ / ২৪৪৫ ২১৩১
ওয়েবসাইট ঃ www.newaliporecollege.com
ই-মেল ঃ newaliporecollege@yahoo.co.in

প্রকাশক ঃ

নিউ আলিপুর কলেজ

প্রকাশকাল ঃ

জানুয়ারি, ২০১৯

প্রচ্ছদ ঃ

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কর

মুদ্রক ঃ

জেপিএস ইনফোমিডিয়া

নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা উপসমিতি

২০১৭-২০১৮

ড. জয়দীপ ষড়ংগী — অধ্যক্ষ

অধ্যাপক দিবেশ বেরা — উপাধ্যক্ষ

অধ্যাপক গোবিন্দলাল মন্ডল — অর্থআধিকারিক

সদস্য ঃ

ড. শিতি কুমারী কুণ্ডু — আহ্বায়িকা

ড. মহসিনা ইকবাল — আহ্বায়িকা

অধ্যাপক গোরাচাঁদ নাগ — (শিক্ষক-সংসদের সম্পাদক)

ড. শ্রাবণী দত্ত

ড. মধুপর্ণা দত্ত

ড. ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী

ড. অনুপম কর্মকার

অধ্যাপিকা রঞ্জনা মন্ডল

ড. সমর্পিতা শেঠ

ড. সোমদত্তা ব্যানার্জী

ড. শ্যামল মন্ডল

শ্রী নীলেশ মাহাতো (ছাত্রসংসদের সম্পাদক)

সহায়কবৃন্দ ঃ

অধ্যাপিকা বুলু মুখোপাধ্যায়

ড. নীলা সরকার

ড. অভিজিৎ পাল

শ্রী অমর মাঝি

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সভাপতি মহাশয়ের শুভেচ্ছা বার্তা	শ্রী অরূপ বিশ্বাস	1
অধ্যক্ষের কলমে	ড. জয়দীপ ষড়ংগী	2
উপাধ্যক্ষের কলমে শুভেচ্ছাবার্তা	অধ্যাপক দিবেশ বেরা	3
শোকসংবাদ		5
সম্পাদিকার কলমে	ড. শিতি কুমারী কুণ্ডু, ড. মহসিনা ইকবাল	9
ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের কলমে	নীলেশ মাহাতো	13
CU Part III Examination Results 2017		14
Congratulations		15
List of Students who Obtained First Class In C.U. Part-III Honours Examination - 2018		18
Sketch	Kousik Sen	19
Sketch	Dr. Anisa Mitra	20
আগুন	ড. জয়দীপ ষড়ঙ্গী	21
অব্যক্ত চেতনা	ড. ভাস্কর ভট্টাচার্য্য	22
যাযাবর আমি	ড. সুদীপ্ত ঘোষ	24
বীরসন্ন্যাসী	ড. রূপালি মাজি	25
রূপে-অরূপে তুমি	অধ্যাপক বাপী মজুমদার	26
স্কেচ	অন্বেষা দাশ	27
ইচ্ছে করে	শ্রেয়া ধাড়া	28
বিদায়	সন্তু নেজ	30
অনুভব	শুভজিৎ দে	30
স্কেচ	অন্বেষা দাশ	31
স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব	রামরতন মুখার্জী	32
স্বপ্নাবিষ্ট	সন্তু নেজ	34
মন	শ্রেয়া ধাড়া	34
মশককাহিনি	প্রকাশ গায়েন	35
স্কেচ	সূর্য চক্রবর্তী	36
উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্র ও সম্পাদক		37
অব্যক্ত বেদনা	সন্তু নেজ	38

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
স্কেচ	রিম্পা মুদী	39
সার্ধ শতবর্ষে প্রমথ চৌধুরী	ড. শিতি কুমারী কুন্ডু	40
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : শতবর্ষের আলোকিত প্রান্তরে	ড. নির্মাল্য মন্ডল	45
১২৫তম বর্ষে শিকাগো বক্তৃতা ও স্বামী বিবেকানন্দ	অধ্যাপিকা রঞ্জনা মন্ডল	49
আইনের দাসত্ব ও মুক্তির পথ	ড. সুদীপ্ত ঘোষ	62
বিজ্ঞানভাবনায় রবীন্দ্রনাথ	অধ্যাপক রাজদীপ দত্ত	64
বাংলার স্থাপত্যকীর্তি ঃ মন্দির	শুভজিৎ দে	71
কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা	অরিজিত মিত্র	77
The Magic of Lothal	Dr. Srabani Datta	78
My Living City	Dr. Dhrubajyoti Banerjee	81
Decoding the inherent pattern of Nature : The Golden Ratio	Prof. Debarati Das	83
The Echoes of ‘Silent Spring’	Dr. Mohsina Iqbal	87
‘City of Joy’ or ‘Unreal City’? : Exploring the Cityscape in Mrinal Sen’s Interview	Prof. Victor Mukherjee	89
The Migratory Birds — and their incredible flight...	Sanchari Bhattacharyya	93
Mangroves	Arko Sengupta	94
Sachin Tendulkar	Arijit Mitra	96
Child Labour	Sreyasi Mondal	97
ডুয়ার্সের টানে	ড. শাশ্বতী চ্যাটার্জী	98
Fascinating Greece: A land of Myths and Modernity	Dr. Neela Sarkar	104
An Overview of the Cultural Activities of College (2017-2018)	Prof. Mauli Sanyal	109
A Report on the field work on the Santals of Susunia	Prof. Nabanita Goswamy	112
New Alipore College Nature Club : The journey begins	Prof. Debarati Das	113
Celebration of National Mathematics Day : A Report	Prof. Rita Chaudhuri	114
নিউ আলিপুর কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আলোচনাসভা — একটি প্রতিবেদন	অধ্যাপক শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়	115
Visit to Agri-Horticultural Society of India- New Alipore College Nature Club Event	Arko Sengupta	118
Report on ‘One Week Research Methodology Workshop’	CMA Dr. Samyabrata Das	119
A Seminar Report on Citizenship and its Various Aspects		121
A Report on the Seminar ‘Ultrafast spin dynamics’organised by Department of Physics	Prof. Kartik Adhikari	122

অরূপ বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পূর্ত, যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

	দুরভাষ	দূরবার্তা
নবান্ন		
৩২৫, শরৎ চ্যাটার্জী রোড,	২২১৪ ১৬১৬	২২১৪ ৪৭৮৮
নবম তল, হাওড়া - ৭১১ ১০২	২২১৪ ৩১৬১	
নব মহাকরণ		
১. কিরণ শঙ্কর রায় রোড	২২৬২ ৪২৪২	২২১৪ ৭৪৬২
এ - ব্লক, সপ্তম তল		
কলকাতা - ৭০০ ০০১		

বর্ষে বর্ষে দলে দলে । আসে বিদ্যামঠতলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়
যৌবনের শ্যামল গৌরবে ।

নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা 'সাম্পান' ২০১৭ ~ ১৮র নতুন বছরের সংখ্যা তার পূর্ণ মহিমা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে। দিনে দিনে একটি কলেজের বড় হওয়া, তার নির্দিষ্ট চরিত্র - রূপ গড়ে ওঠবার পর্বের সমস্ত খবর যথাযথ ভাবে সংগ্রহে রাখাটা জরুরী। কলেজ পত্রিকার নিয়মিত সংখ্যাগুলি কিছুটা হলেও এই পরিবর্তনের ইতিহাসের যোগ্য স্মারক। ১৯৬৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে আজ পঞ্চাশোর্ধ সময়ের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রটিকে অবিরাম কর্ষণ করে চলেছে যে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর দল, কলেজ পত্রিকা তাদের এক টুকরো আনন্দের বাতায়ন। ছাত্রছাত্রীদের আত্মপ্রকাশে ইচ্ছুক তারুণ্যের জন্য আপন ঘরের বিশ্ব হয়ে উঠেছে এই কলেজ প্রাঙ্গণ। আর তাদের সৃষ্টিশীল চৈতন্যের মুক্তির জন্য অন্যতম অবকাশটুকু রচনা করে দিয়েছে কলেজ পত্রিকা। ঘরের মঞ্চ প্রস্তুত। বাইরে অপেক্ষায় সৃজনের বিরাট বিশ্ব। ছাত্রছাত্রীদের ঘর আর বাইরের সেতুবন্ধনের জন্য এই আনন্দ যজ্ঞে নিয়মিত অংশীদার হয়ে তাদের যোগ্য সঙ্গত করে চলেছেন কলেজের সকল প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপক/অধ্যাপিকা, শিক্ষা কর্মী, ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিবর্গ - অভিনন্দন তাঁদেরও। 'সাম্পান' এর অর্থ তো ভেলা। আগামী স্বপ্নের পথে তরী ভাসিয়েছে আমাদের প্রিয় নবীনের দল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাতেই তাদের উদ্দেশ্যে বলি ~

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী "

১৫ নভেম্বর, ২০১৮

অরূপ বিশ্বাস

যোগাযোগ ঃ ৫৫/এ, ইন্দ্রাণী পার্ক, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৩৩
দুরভাষ ও দূরবার্তা ঃ ২৪২২ ৮১৬৬, নিবাস ঃ ২৩৯৯ ২৯০৯
চলভাষ ঃ ৯৮৩০০ ৫১৪৮৪, বৈদ্যুতিন বার্তা ঃ biswas.aroop@gmail.com

অধ্যক্ষের কলমে

ড. জয়দীপ ষড়ংগী

'সাম্পান' পত্রিকার প্রকাশে মিশে আছে ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উদ্যম, আবেগ ও বিশুদ্ধতা। দিনানুদৈনিকের গ্লানির ধূসরতা আনে অবসাদ ও হতাশা। সৃষ্টি দেয় আশা। নতুন লেখা বাঁচার মোহিনী আমন্ত্রণ জানায়। আর তখনই সকল বাধা ধন্য করে ফুটে ওঠে লাল গোলাপ। জীবনের ব্যাপ্তিই উঠে আসে লেখার কলমে। নতুন ভাবনার আনন্দ আমাদের জীবনকে করে তোলে সুন্দর। মহত্ব আর বিনয় হল উপলব্ধির নরম নিবিড় পথ।

লেখা কেবলমাত্র ইস্তাহার নয়। এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জুড়ে রয়েছে মহুয়ার গন্ধ। অনেক সময় এর উপলব্ধি নির্জন দ্বীপের মত সুদূর নিঃসঙ্গ। এবারের লেখাগুলি যেন রক্তের প্রবাহ। কৃষ্ণগহ্বর থেকে আমরা নিয়ে আসছি ঝিনুকের নৌকো। অনেক লেখাই নিজস্বতায় ও প্রকাশবৈচিত্র্যে শক্তিশালী। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই লেখার চর্চাটা নিয়মিত ধরে রাখবে ও কলকাতার সাহিত্যসংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে। ভালো লেখা আকালী-আনন্দময় সাত ঘোড়ার মতো গতিময়। লেখকরা সামাজিক ও সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ, চক্রব্যূহভেদী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা ভিড়ের মধ্যে বিশেষ জায়গা করে নেবে।

উপাধ্যক্ষের কলমে শুভেচ্ছাবার্তা

অধ্যাপক দিবেশ বেরা
উপাধ্যক্ষ

'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, —
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে —
বন্ধন হোক ক্ষয়।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকার আর একটি জন্মদিন উপস্থিত। কলেজ পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যে-কোনো কলেজেরই পক্ষে একটি স্বাভাবিক বিষয়। এই ধরনের পত্রিকার একটি নিজস্ব দপ্তর থাকে, তার কয়েকজন কুশলী দপ্তরি থাকাটাও দস্তুর। এর সঙ্গে রয়েছে কর্তৃপক্ষের, অধ্যাপকমহলের ও ছাত্রসংগঠনের সামগ্রিক সহযোগিতা। কিন্তু পত্রিকার আসল প্রাণশক্তি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা — তারাই আপন আপন অন্তরঙ্গের ভাবটিকে রেখায় রঙে রূপ দিয়ে সাজিয়ে তোলে পত্রিকার অন্দরমহল। নিউ আলিপুর কলেজের প্রতিমুখ হিসেবে কলেজ পত্রিকা বিগত বছরের কার্যবিবরণীর ও সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত খতিয়ান উপস্থিত করেছে। অতীতের অসমাপ্ত কাজগুলি আগামী সময়ে পূর্ণ হবে নিশ্চয়ই। সেদিনের পত্রিকার পাতায় সেই পরিসংখ্যান চিহ্নিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আর এক নতুন লক্ষ্য সামনে তৈরি হয়ে উঠবে। পত্রিকার পাতায় পাতায় ভাবীকালের স্বপ্ন পূরণের ইতিবৃত্ত রূপ পাবে — এমনটাইতো প্রত্যাশিত। কলেজ জীবনে ছাত্রছাত্রীরা তাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে পার হয়। প্রথম তারুণ্য শুধু ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের জন্যই তাদের প্রস্তুত করে না, তাদের মানসক্ষেত্রের কাঠামোকেও গড়ে দেয়। কলেজ পত্রিকা তাদের অস্ফুট আবেগ, সঙ্কুচিত শিল্পীমনকে এক টুকরো জমি দেয়। কলেজের স্বাস্থ্যকর আলো-জল-হাওয়ায় বেড়ে ওঠে আগামী দিনের কারিগরেরা। এই কারিগরি প্রকল্পকে পরমোৎসাহে সযত্নে বছরের পর বছর ধরে রূপায়িত করার সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে থাকেন, সেই সমস্ত ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী,

ছাত্রসংগঠনের সদস্য এবং প্রশাসনিক স্তরের ব্যক্তিবর্গ — সকলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। এত মানুষ মিলেমিশে যে নিউ আলিপুর কলেজ পরিবারটি দিনে দিনে গড়ে উঠেছে, তার শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম মুখপত্র এই পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটির সম্পর্কে মূল্যবান প্রতিক্রিয়াগুলি পত্রিকার আগামী সমৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শুধু বুদ্ধিবৃত্তি, বিচারশক্তির মতো ভালো বিষয়গুলি দিয়েই একটি জাতি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে না। হৃদয়ের প্রবল উচ্ছ্বাস, গভীর বিশ্বাস, অপরিমেয় উৎসাহ, কল্পনাপ্রিয় ভাবের মাধ্যমেই জীবনের গভীরতম রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। উপলব্ধির সেই স্তরে পৌঁছোতে ছাত্রছাত্রীদের যোগ্য সহায়তা করুক কলেজ পত্রিকা, তাদের সৃজনীবৃত্তির, ভাবোচ্ছ্বাসের উন্মোচনে দীক্ষিত হয়ে এখান থেকেই তারা ছড়িয়ে পড়ুক কর্মৈষণার নানা প্রান্তরে। স্বামীজির কথাই তাদের অনুপ্রেরণা হয়ে উঠুক — 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত' অর্থাৎ 'উঠ, জাগো, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, ততদিন ক্রমাগত সেই উদ্দেশ্যে চলিতে থাক, ক্ষান্ত হইও না।'

শোকসংবাদ

ঁ নিত্যানন্দ দাস

"চৌদিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে,
তোমার আনন্দমুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।।"

বাংলা সাম্মানিক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমাদের সকলের প্রিয় নিত্যানন্দ দাস-এর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী তার অসাধারণ অধ্যয়নস্পৃহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারের বিচ্ছেদকাতর সদস্যদের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শোকসংবাদ

ঁঅধ্যাপক স্বপন ঘোষ রায়

"তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিউ আলিপুর কলেজ পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক স্বপন ঘোষ রায় মহাশয়ের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অধিক কাল আন্তরিক নিষ্ঠা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে কলেজ পরিচালনার দায়িত্বভার পালন করে তিনি এই বিদ্যায়তনকে সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে পরিচালিত করেন। এই কলেজ তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। সুমধুর ব্যবহারে তিনি আত্মীয়তার এক পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিলেন। এই দরদি শিক্ষাবিদ এবং কর্তব্যপরায়ণ কর্মনায়কের প্রয়াণে আমরা গভীর ব্যথিত। তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি এবং পরিবারের বিচ্ছেদকাতর সদস্যদের প্রতি অন্তরের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শোকসংবাদ

ঁ পর্ণা দত্ত

"বড়ো বেদনার মতো, বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,"

প্রাণীবিদ্যা সাম্মানিক বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, পর্ণা দত্তর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা মর্মাহত। প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা পর্ণা ছিল অসীম সম্ভাবনার প্রতীক। কিন্তু অকালমৃত্যু তার জীবনের সকল সম্ভাবনার দুয়ার রুদ্ধ করে দিয়েছে। তাই ব্যথাহত চিত্তে তার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শোকসংবাদ

ড. হাসি রায়

"তুমি রবে নীরবে হৃদয় মম"

নিউ আলিপুর কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপিকা ড. হাসি রায়-এর অকালপ্রয়াণে আমরা গভীর শোকাহত। দীর্ঘ নয় বছর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্বভার পালন করেছেন। তাঁর অজস্র গবেষণাপত্র বিদেশেও যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে। দৃঢ়চিত্ত ও কর্তব্যপরায়ণ এই দরদি শিক্ষাবিদ তাঁর সুমধুর ব্যবহারে এক আত্মীয়তার পরিমন্ডল গড়ে তুলেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য কালান্তক ব্যাধি তাঁকে আমাদের কাছ থেকে চিরতরে ছিনিয়ে নিয়েছে। তাঁর পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করি।

সম্পাদিকার কলমে

> "........... সংস্কৃতি শুধু মনের একটা বিলাস নয়, শুধুমাত্র মনের সৃষ্টি-সম্পদও নয়। উহা বাস্তব প্রয়োজনে জন্মে এবং মানুষের জীবনসংগ্রামে শক্তি জোগায়, জীবনযাত্রার বাস্তব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।"
>
> — গোপাল হালদার

নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা 'সাম্পান' প্রকাশনা অবশ্যই হয়ে উঠেছে কলেজের এক গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্থবিরতা নয়, বহমানতাই হল জীবনের লক্ষ্য। কলেজ পত্রিকা জীবনের প্রথম প্রকাশের বহুসম্ভাবনাময় উজ্জ্বল তোরণদ্বার, যে পথ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবরুদ্ধ ভাবাবেগ ও চিন্তাশক্তি প্রকাশের দুর্লভ সুযোগ লাভ করে। তাদেরই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও তাগিদে সমাগত হল বহুপ্রতীক্ষিত শুভ মুহূর্তটি — নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা ২০১৭-২০১৮ সংখ্যা প্রকাশিত হল। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দের যৌথ প্রয়াসের সম্মিলিত যোগফল হল 'সাম্পান' (ভাসমান নৌকা) নামক সাহিত্যিক ফসল যা আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো মুষলধারে ভাববর্ষণ করে এগিয়ে চলেছে স্থির লক্ষ্যে।

আমাদের মনে বিবিধ অনুভূতি থাকলেও দুটি বিপরীত ভাবের প্রাবল্য বেশ ভালোভাবেই অনুভব করে থাকি যা দুই বিপরীত কোটিতে বিরাজমান। একটি হল দু:খ, বেদনা; অপরটি হাসি, আনন্দ। আমাদের সকলকে অশ্রুজলে সিক্ত করে চলে গেলেন কলেজের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক স্বপন ঘোষ রায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপিকা ড. হাসি রায়, আমাদের ছাত্র নিত্যানন্দ দাস এবং ছাত্রী পর্ণা দত্ত। ব্যথাহত চিত্তে এঁদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। দীর্ঘদিন নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের অনবদ্য উপাচারে কলেজকে সমৃদ্ধ করে অবসর নিলেন শিক্ষাকর্মী শ্রীমতী মিনতি মন্ডল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁর সুস্থ অবসরজীবন কামনা করি। কালের যাত্রায় কলেজ-রথকে গতি দিতে, কর্ম্মমুখরতার ঢেউ তুলতে কলেজ অঙ্গন ভরিয়ে তুললেন নবাগত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ। তাঁরা হলেন নবীন অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কর (সংস্কৃত বিভাগ), অধ্যাপক বাচ্চু পাল (কম্পিউটার সায়ন্স), ড. রূপালি মাজি (পদার্থবিদ্যা বিভাগ), ড. অজয় কুমার প্রামাণিক (রসায়ন বিভাগ)। এঁদের সকলকেই জানাই সাদর অভ্যর্থনা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই শক্তির স্ফুলিঙ্গ ভস্মাবৃত অবস্থায় থাকে। প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের জোরেই সেই ভস্মরাশি অপসারিত হয়ে অন্তরশায়ী শক্তির প্রকাশ ঘটে। আপন পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার দ্বারাই এবছরও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মান-নির্ণায়ক পরীক্ষায় সাফল্যের নজির রেখেছে। রসায়ন বিভাগ ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা জীবন-প্রভাতের পূর্ব-দিগন্তে ঘটায় নবসূর্যোদয়। ২০১৮-এর ২৮-শে জানুয়ারি বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে 'বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টার'-এর উদ্যোগে বিজ্ঞান মেলায় পদার্থবিদ্যা সাম্মানিক বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের দুজন ছাত্রী পায়েল খাঁড়া ও হেনা রায় যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে এবং ২০১৮-এর ১০-ই ফেব্রুয়ারি

‘গ্রেটার কলকাতা কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’-এর উদ্যোগে সায়ন্স একজিবিশন অ্যান্ড বিজয়ন উৎসব-এ পদার্থবিদ্যা বিভাগের উপরোক্ত ছাত্রীদ্বয় যুগ্ম প্রথম স্থান অধিকার করে বিজ্ঞান সাধনার ক্রম-পরিণামের ধারা অক্ষুন্ন রাখে। অন্যদিকে ২০১৮-এর ১১-ই মে উইমেন্স ক্রিশ্চিয়ান কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের ওপর একটি ‘আন্ত:কলেজ প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা’য় অংশগ্রহণ করে বাংলা সাম্মানিক বিভাগের তৃতীয় বর্ষের দুজন ছাত্রী শ্রেয়া ধাড়া ও সুনীতা সামন্ত যুগ্মভাবে প্রথম স্থান অধিকার করে বিভাগের দীর্ঘলালিত স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে। ছাত্রছাত্রীদের প্রকাশোন্মুখ সৃজনীশক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর বিখ্যাত একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি স্মরণে এসে যায় —

> ‘‘ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা বিশ্ব-বিদ্যা-শিক্ষালয়ে,
> অন্নহীনে অন্ন দিতে ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ’য়ে;’’

জীবন কতগুলো বছর, মাস, দিনের সমাহারমাত্র নয়; জীবন মহত্তর এবং কর্মই জীবন। কর্মের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা। নিউ আলিপুর কলেজেও বছর জুড়ে নানান কর্মধারার স্রোত বহমান। কলেজের নব্যপ্রতিষ্ঠিত ‘মানবী বিদ্যা চর্চা কোষ’ ২০১৭ সালের জুলাই মাসে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনাচক্রের আয়োজন করে এবং ২০ নভেম্বর লিঙ্গবৈষম্যমূলক সচেতনতাবিষয়ক একটি পথনাটিকা অভিনয়ের মাধ্যমে সকল সামাজিক লিঙ্গের সমান অধিকার ও দায়িত্ব পালনের দিকটি স্মরণ করিয়ে দেয়। কলেজের কালচারাল সাবকমিটির উদ্যোগে ২০১৭-এর ৯-ই সেপ্টেম্বর বনমহোৎসবের আয়োজন করে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার ভারসাম্য রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে ঐদিনই কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজের সজীবতম অংশ ছাত্রছাত্রীদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করে পুরস্কৃত করা হয়। উপরোক্ত কমিটির উদ্যোগে ২৮-শে অক্টোবর, ২০১৭ ভগিনী নিবেদিতার জন্ম সার্ধ শতবর্ষ উদ্‌যাপন করে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। ২০১৭-এর ১৪-ই নভেম্বর শিশুদিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে লোকসেবার ব্রতধারী কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দলবদ্ধভাবে নিউ আলিপুর রেলস্টেশনের চারপাশে ছোটো ছোটো শিশুদের হাতে সামান্য উপহার তুলে দিয়ে মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই বিভাগেরই তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা ২২-শে নভেম্বর, ২০১৭ বিধানসভা পরিদর্শনে যায় যা তাদের পাঠ্যসূচির অপরিহার্য অঙ্গ। ২০১৭-এর ২১-শে নভেম্বর শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ তাদের স্বল্প সামর্থ্যে বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পুরুলিয়া জেলার প্রাকৃতিক আকর্ষণীয় স্থান পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমাপ্ত করে। ওই বছরই ২৫-শে নভেম্বর ইতিহাস বিভাগ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যায় রবীন্দ্র-স্মৃতিবিজড়িত স্থানের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার জন্য। পিছিয়ে নেই সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাও ২০১৭-এর ১৪-ই নভেম্বর শিশুদিবসে কলেজের কাছাকাছি একটি স্থানে গিয়ে দুঃস্থ শিশুদের মুখে খাবার তুলে দিয়ে সকলকে মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ করে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ ওই বছরই ৩১-শে জানুয়ারি থেকে ২-রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাদের ছাত্রছাত্রীদের পুরুলিয়ায় নিয়ে গিয়ে সেখানকার পাহাড়ি আদিবাসী শিল্পীদের ছৌ নৃত্য পরিদর্শন করিয়ে ওই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করে। বিভাগ ফেব্রুয়ারি মাসে ‘ডিজিটাল ফিল্ম মেকিং ফোকাসিং অন দ্য ক্র্যাফ্ট অফ এডিটিং অ্যান্ড ইটস্ ইমপ্যাক্ট’-এর ওপর ৫ দিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করে বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করে। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে দর্শন, অর্থনীতি ও সংস্কৃত বিভাগের যৌথ উদ্যোগে প্রায় পঞ্চাশ জন

ছাত্রছাত্রী মার্বেল প্যালেসে গিয়ে শতাব্দীপ্রাচীন স্থাপত্য ও মনোমুগ্ধকর ভাস্কর্য পরিদর্শন করে এক অনাবিল আনন্দ লাভ করে এবং সেই দিনই কবিগুরুর স্মৃতিবিজড়িত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির আড়ম্বরহীন কিন্তু সুষমাময় গৃহসজ্জা ও বিবিধ শিল্পসম্ভার প্রত্যক্ষ করে তাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমাপ্ত করে।

সবথেকে উৎসাহব্যঞ্জক দিক হল ২০১৭ সালের ২০-২২-শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী কলেজের শীতকালীন কার্নিভ্যাল 'অ্যাভেনসিস-২০১৭' মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, সংগীতের কর্মশালার আয়োজন, বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে 'অ্যাভেনসিস-২০১৭'-এর সমাপ্তি ঘোষিত হয়। গণিত বিভাগ শ্রীনিবাস রামানুজনের ১৩০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২২-শে ডিসেম্বর, ২০১৭ 'ন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স ডে' হিসেবে পালন করার জন্য একটি অধিবেশন (Conference)-এর আয়োজন করে। কলেজের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত 'নেচার ক্লাব' পরিবেশসচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পরিবেশদূষণ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করে তোলে। কলেজের নৃবিজ্ঞান বিভাগ ২০১৭-এর ১২-ই নভেম্বর থেকে ৩০-শে নভেম্বর পর্যন্ত সুসুনিয়াতে তৃতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা (Field-work) চালায় এবং ২৭ ও ২৮-শে জানুয়ারি, ২০১৮ তৃতীয় বর্ষের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বেহালার 'স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম' পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভাগীয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ সমাপ্ত করে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ৩০-শে নভেম্বর, ২০১৭ সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'বকখালি হেনরিদ্বীপ' সহ বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন, ২০১৭-এর ৬-ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় বর্ষের সাম্মানিক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস বোটানিক গার্ডেনে' শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ২০১৮-এর ২৬-শে মার্চ দ্বিতীয় বর্ষের সাম্মানিক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'কলেজ প্রাঙ্গণ' ও পারিপার্শ্বিক স্থানে ভ্রমণ, ওই বছরই ২৭-শে মার্চ দ্বিতীয় বর্ষের সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 'বাখরাহাট-বুড়ির পোল' অঞ্চলে বাস্তুবিদ্যার শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে বিভাগীয় উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখে। প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ২০১৭-এর নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উড়িষ্যার গোপালপুর ও মঙ্গলাদড়ি অঞ্চল, ২০১৮-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে দ্বিতীয় বর্ষের সাম্মানিক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গড়িয়ার পঞ্চসর লেক, ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বর্ষের সাম্মানিক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা এবং তৃতীয় বর্ষের সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার 'নেচার ক্লাব' পরিদর্শনের মাধ্যমে বিভাগীয় উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

কলেজের আইকিউএসি (ইনটারনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুউর‍্যান্স সেল) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে কলেজের বাণিজ্য, অর্থনীতি এবং গণিত বিভাগ ২০১৮ সালের ১৪-ই মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী 'রিসার্চ মেথোডোলজি'র ওপর একটি কর্মশালার আয়োজন করে কলেজের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কলেজের প্রতিটি বিভাগ ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এক বা একাধিক 'সেমিনার'-এর আয়োজন করে জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানতৃষ্ণা দূরীকরণে সহায়তা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প 'সুকন্যা'-তে অংশগ্রহণকারী ছাত্রীদের আত্মসুরক্ষার বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য কলকাতা পুলিশের নির্বাচিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষকদের দ্বারা তিনমাস ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণশিবির কলেজ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে। কলেজের এনসিসি-র ক্যাডেট বাহিনী এবং এনএসএস-এর ভলান্টিয়ারদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ অবশ্যই প্রশংসনীয়। পুনরায় ফিরে তাকাতে হয় 'কালচারাল কমিটি'র

দিকে। ২০১৮ সালের ৬-ই মার্চ প্রভাতফেরির মাধ্যমে বসন্তোৎসব সূচিত হয় যেখানে শান্তিনিকেতনের আদবকায়দায় কলেজের মুক্তপ্রাঙ্গণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২০১৮-এর ১৫-ই মে মহাসমারোহে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

সর্বপ্রথম পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অরূপ বিশ্বাস মহাশয়ের অকৃপণ সহযোগিতা ও প্রেরণা প্রদানের জন্য তাঁকে অকুণ্ঠিতচিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই। আগামী দিনে কলেজ-তরিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার কান্ডারি নবাগত অধ্যক্ষ মহাশয়কে স্বাগত জানাই এবং পত্রিকা সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁর স্বত:স্ফূর্ত সহায়তাদান ও উৎসাহপ্রদানের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। যেসমস্ত ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ স্বরচিত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনি, প্রতিবেদন এবং চিত্র দিয়ে পত্রিকার কায়া নির্মাণে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলকেই সর্বান্ত:করণে ধন্যবাদ প্রদান করি। অবশ্যই ধন্যবাদার্হ কলেজের মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় যাঁর প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাদের উজ্জীবিত করেছে। কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাই কলেজের নবীন অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কর মহাশয়কে যিনি পত্রিকাটির প্রচ্ছদ নির্মাণ করে অপূর্ব সৃজনকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ধন্যবাদপ্রাপক অধ্যাপক গোরাচাঁদ নাগ, অধ্যাপিকা বুলু মুখোপাধ্যায়, ড. নীলা সরকার, ড. অভিজিৎ পাল, অধ্যাপিকা দেবারতি দাস, গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুমনা গাঙ্গুলী, অধ্যাপক অমর্ত্য সাহা, অধ্যাপক অনিরুদ্ধ কর, অধ্যাপিকা গুড্ডু সিং, অধ্যাপক রাজদীপ দত্ত এবং শিক্ষাকর্মী শ্রী অমর মাঝি যাঁরা পত্রিকা সংকলনের ব্যাপারে অকৃপণহস্ত ছিলেন। ধন্যবাদ জানাই কলেজের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে যাঁদের সুচিন্তিত মতামত পত্রিকার কলেবর নির্মাণ করেছে। ধন্যবাদভাজন কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নীলেশ মাহাতো যার পূর্ণ সহযোগিতায় আমরা অভিভূত। জেপিএস ইনফোমিডিয়ার কর্ণধার শ্রী প্রসেনজিৎ সরকার মুদ্রণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করায় তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই। পত্রিকা প্রকাশে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির প্রেরণায় পৃথিবী যেমন তার অনন্ত সূর্যপরিক্রমার পথে এগিয়ে চলে তার সঙ্গে সুরছন্দলয় মিলিয়ে নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা 'সাম্পান'ও এগিয়ে চলবে কালের অনন্ত যাত্রাপথে। আশা করি আগামী দিনে পত্রিকাটি ফুলেফলে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সবশেষে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এর একটি বাণীর মাধ্যমে সমাপ্তিরেখা টানছি —

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরংশ্চরৈবেতি।।"

জানুয়ারি, ২০১৯

ড. শিতি কুমারী কুণ্ডু
এবং
ড. মহসিনা ইকবাল
যুগ্ম আহ্বায়িকা
নিউ আলিপুর কলেজ পত্রিকা কমিটি

ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের কলমে

নীলেশ মাহাতো
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্রসংসদ

প্রতিবারের ন্যায় এবারও আমার লেখাটি কলেজ পত্রিকায় দিতে পেরে গর্বিত বোধ করছি। এই সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের উপাধ্যক্ষ মহাশয় সহ সকল শিক্ষকশিক্ষিকাকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই এবং যাদের সহযোগিতায় আমি নিউ আলিপুর কলেজের ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক হতে পেরেছি সেই সকল ভাই-বোনদের আমার অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে ভালোবাসা ও অভিনন্দন জানাই এবং সবশেষে যাদের জন্য আমি ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদকের নির্বাচনটিতে সঠিক সম্মান পেয়েছি সেইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ দাদাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। দেখতে দেখতে আমি এই কলেজের সাধারণ সম্পাদক পদে দুই বছর অতিক্রম করলাম। এই অনুভূতিটি সকলের সাথে ভাগ করে নিতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। এই দুই বছরের মধ্যে যেসকল কাজগুলি আমি ছাত্রছাত্রী ভাই-বোনদের জন্য করেছি তা শুধুমাত্র তাদের সুবর্ণ ভবিষ্যতের কথা ভেবে। কিছু কথা থেকে যায়, যা হয়তো মুখে বলে প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু সেইসকল কথাগুলি এই পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পেরে ভালো লাগে। যেসকল ছাত্রছাত্রী তাদের সুবর্ণ ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজেদের আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে এগিয়ে আসে তাদের সর্বদাই উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

আমিও এই কলেজের বর্তমান ছাত্র হয়ে মনে করি, পড়াশোনার সাথে সাথে নিজেকে অন্যান্য কর্মসূচিতে লিপ্ত করা উচিত। সেই কারণে সকল ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে ছাত্রসংসদ ও শিক্ষকশিক্ষিকাবৃন্দ একযোগে প্রত্যেক বছর নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন।
তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ—

সাংস্কৃতিক উৎসব

১। রাখিবন্ধন উৎসব
২। ১৫-ই আগস্ট স্বাধীনতাদিবস উদ্‌যাপন
৩। শিক্ষকদিবস পালন
৪। বনমহোৎসব
৫। স্বাস্থ্যশিবির
৬। রক্তদান
৭। অ্যাভেনসিস (শীতকালীন কার্নিভ্যাল)
৮। ২৬-শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্রদিবস পালন
৯। বসন্তোৎসব
১০। বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১। ইনডোর গেম
ক) ক্যারাম
খ) টেবিল টেনিস
গ) দাবা
ঘ) ব্যাডমিন্টন (মেয়েদের জন্য)
ঙ) ট্রেজার হান্ট
২। বার্ষিক ক্রিকেট লিগ

এছাড়াও যে কথাটি না বললে এই লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায় সেটি হল —

- শিক্ষার প্রগতি
- সংঘবদ্ধ জীবন
- দেশপ্রেম

এই তিনটি আদর্শকে পাথেয় করে আমি ভবিষ্যতেও এগিয়ে চলব এবং ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে কলেজের নাম আরও উজ্জ্বল করব।

CU Part III Examination Results 2017

Level	Programme	Broad Discipline/Group Name	Discipline/ Subject	Total Number of Students Appeared in Final Year	Total Number of Students Passed/ Awarded Degree	Total Number of Students Passed with 60% or above
Under Graduate	B.Sc.(H) Bachelor of Science	Computer Science	Science	10	5	4
		Chemistry		21	19	7
		Botany		2	1	1
		Zoology		31	30	12
		Physics		17	9	2
		Mathematics		9	6	2
		Economics		1	1	1
		Anthropology		15	10	2
		B.Sc General		75	28	
	B.A(H) Bachelor of Arts	Political Science	Arts	7	5	
		Sanskrit		2	1	
		Bengali		24	14	
		English		28	22	
		Education		38	28	1
		Philosophy		3	2	
		History		9	4	
		Journalism & Mass Communication		19	13	1
		B.A General		214	52	
	B.Com. Bachelor of Commerce	Commerce (H)	Commerce	102	24	2
		Commerce(G)		122	11	

CONGRATULATIONS

The following prizes for academic excellence were awarded to the outgoing students of the college of the year 2017

PRIZES	WINNERS
1. Guha Bijanprava Dhirendralal Memorial Prize instituted by Dr. Samarendra Guha, Former Principal of this college, for securing highest marks in Honours subjects among all streams of B.A/ B.Sc/ B.Com Final Examination of C.U.	Oishik Kar (Zoology Honours)
2. Dr. Sankar Chandra Ghosh Prize instituted by Dr. Sankar Chandra Ghosh, Former Head of the Dept. Of Chemistry for securing highest marks in the B.A Examination of C.U.	Sagarika Das (Education Honours)
3. Principal Dr. Arun Kumar Bose Memorial Prize instituted by Prof. Sachin Kumar Ghosh, Former Head of. the Dept. of Chemistry for securing highest marks in the B.Sc. Examination of C.U.	Oishik Kar (Zoology Honours)
4. Rathindra Nath Majumder Memorial Prize awarded in memory of Late Rathindranath Majumder, S.G. Lecturer in the Dept. of English for securing highest marks in English Honours in the B.A. Examination of C.U.	Anish Banerjee (English Honours)
5. Krishna Mukherjee Memorial Prize instituted by Prof. Bulu Mukhopadhyay, Head of the Dept. of English for securing highest marks In English / Bengali Honours in the B.A. Examination of C.U.	Anish Banerjee (English Honours)
6. Mayukh Mohan Ghosh Memorial Prize instituted by Prof. Sujash Nilay Ghosh, Former Head of the Dept. of Bengali, for securing highest marks in Bengali Honours in the B.A. Examination of C.U.	Susmita Sardar (Bengali Honours)
7. Ajit Kumar Das Memorial Prize instituted by Dr. Kakali Das, Former Head of the Dept. of Sanskrit for securing highest marks in Sanskrit Honours in the B.A. Examination of C.U.	Amit Sardar (Sanskrit Honours)

8.	Nirmal Chandra Gupta Memorial Prize for securing highest marks in History Honours in the B.A. Examination of C.U.	Vivekananda Mondal (History Honours)
9.	Nitindranath Basu Memorial Prize instituted by Prof. Jayati Ray Chaudhuri, Former Head of the Dept. of Philosophy for securing highest marks in Philosophy Honours in the B.A. Examination Of C.U.	Upasana Paul (Philosophy Honours)
10.	Dr. Birendranath Goswami Memorial Prize instituted by Late Sukla Goswami, Former Head of the Dept. of Sanskrit for securing highest marks in Political Science Honours in the B.A. Examination of C.U.	Madhumita Jana Sahoo (Political Science Hons.)
11.	Priyatosh Sen Choudhury Memorial Prize instituted by Prof. Payal Sen Choudhury, Head of the Dept. of Journalism and Mass Communication for securing highest marks in Journalism and Mass Communication Honours in the B.A. Examination of C.U.	Tanusri Tarafder (Journalism and Mass CommunicationHons)
12.	Prize for securing highest marks in Education Honours in the B.A. Examination of C.U.	Sagarika Das (Education Honours)
13.	Dr. Hrishikesh Chatterjee Memorial Prize awarded in honour of Late Hrishikesh Chatterjee, Former Head of the Dept. of Chemistry for securing highest marks in Chemistry Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Saikat Bag (Chemistry Honours)
14.	Phul Rani Lahiri Memorial Prize instituted by Dr. Saswati Chatterjee , Head of the Dept. of Chemistry awarded for securing highest marks in Chemistry Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Saikat Bag (Chemistry Honours)
15.	Dr. Manoranjan Biswas Prize instituted by Dr. Manoranjan Biswas, Former Head of the Dept. of Physics for securing highest marks in Physics Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Subhajit Hazari (Physics Honours)

16. Dr. Debrupa Chakraverty Memorial Prize instituted By Dr. Anindya Dutta, Dept. of Physics, C.U in memory of Late Dr. Debrupa Chakraverty, Former Teacher of the Dept. of Physics, of this college for securing highest marks in Physics Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Subhajit Hazari (Physics Honours)
17. Prize for securing highest marks in Mathematics Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Sapiya Khatoon (Mathematics Hons)
18. Prize for securing highest marks in Botany Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Sangita Sinha (Botany Honours)
19. Prize for securing highest marks in Zoology Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Oishik Kar (Zoology Honours)
20. Prize for securing highest marks in Computer Science Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Sushmita Saha (Computer Science Hons)
21. Prize for securing highest marks in B.Com Honours in the B.Com. Examination of C.U.	Bidesh Biswas (B.Com Honours)
22. Prize for securing highest marks in Economics Honours in the B.Sc. Examination of C.U.	Asin Kar (Economics Honours)

NAMES OF STUDENTS WHO OBTAINED FIRST CLASS IN C.U. PART-III HONOURS EXAMINATION - 2018

DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY

1	SAYAN CHAKRABORTY	564
2	ADITI DAS	553
3	DAIPAYAN GHOSH	551
4	M. SHINE	550

DEPARTMENT OF BENGALI

1	SHREYA DHARA	481

DEPARTMENT OF BOTANY

1	ANKITA SARKAR	495
2	SUSHMIT BANERJEE	492

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1	SUBHOJIT CHAKRABORTY	582
2	SIKTA CHAKRABORTY	535
3	BIPLAB DAS	532
4	ABHIJIT NANDI	524
5	SAYANTAN CHONGDAR	503

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

1	UTTAM HATI	639

DEPARTMENT OF PHYSICS

1	SOURAV GHARAMI	512
2	SWARNA BANIK	491
3	SOURAV DEY	486

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

1	DEEPSHIKHA MITRA	585
2	SUDESHNA SINHA	549
3	DIYA BANERJEE	519
4	AVISHEK DAS	512
5	SWARAJ RANJAN GUPTA	484

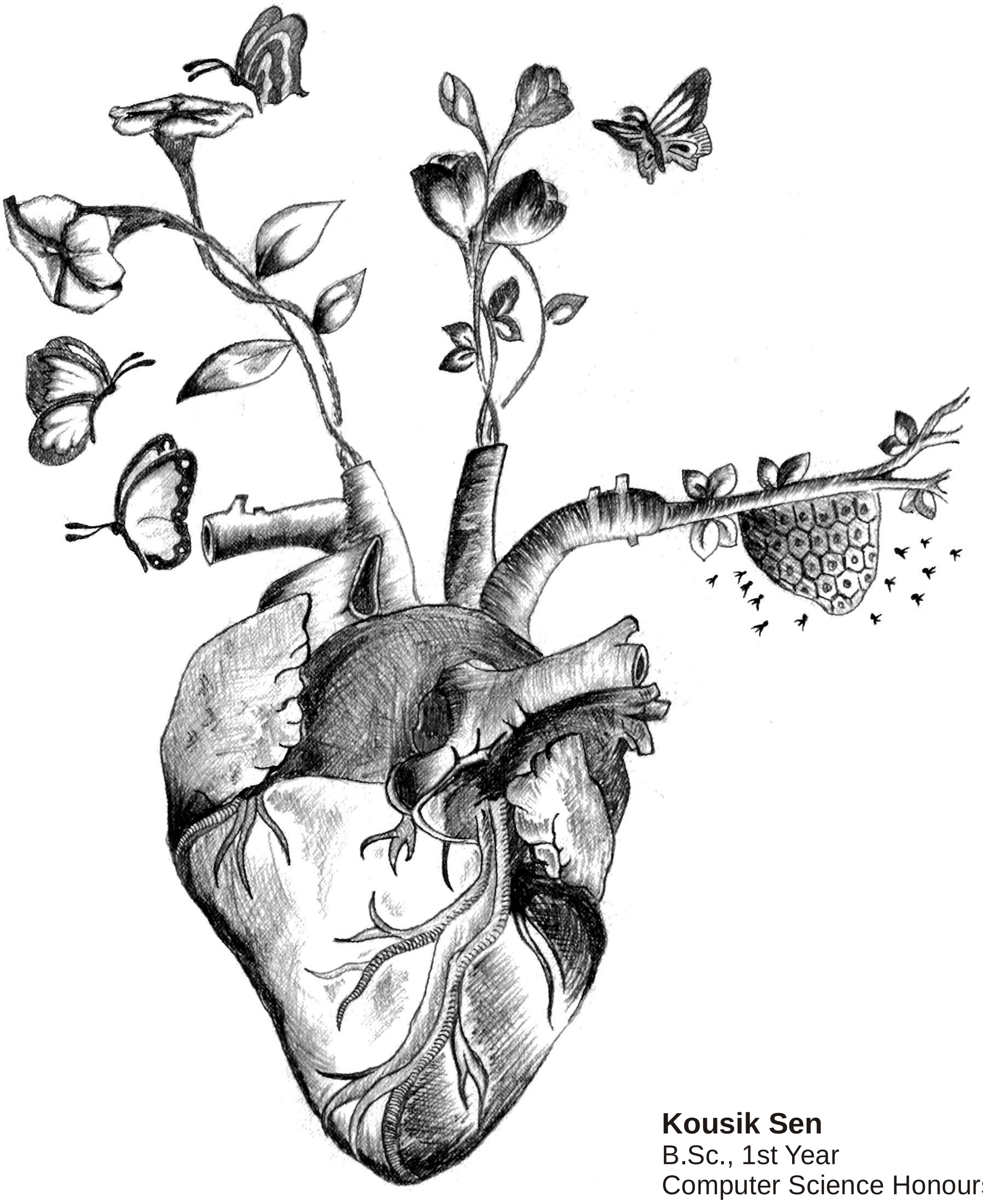

Kousik Sen
B.Sc., 1st Year
Computer Science Honours

"শিল্পের মূল আবেদন আবেগগত। তাই শিল্পকে হৃদয়সংবেদ্য হতেই হয়।"
— দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

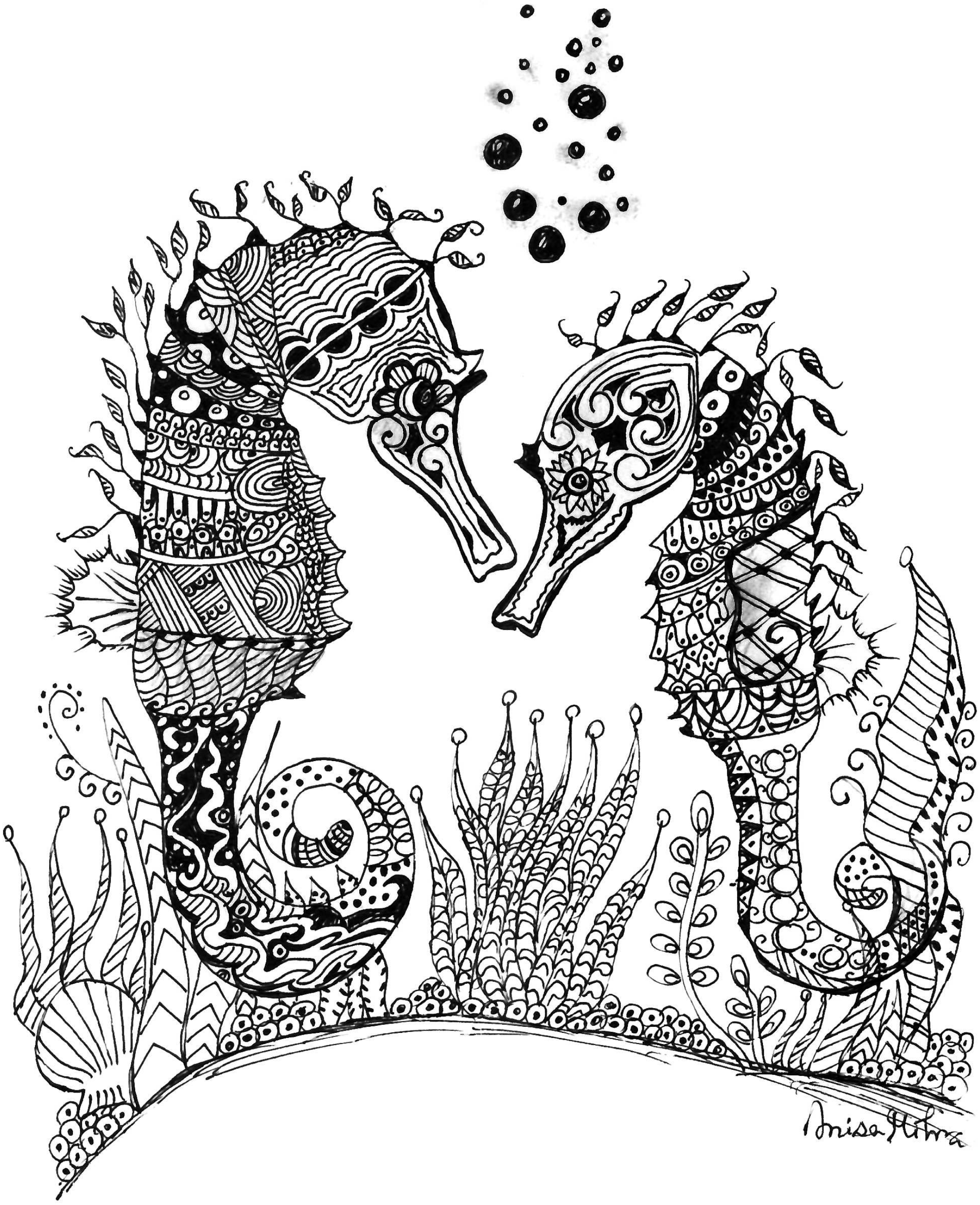

Dr. Anisa Mitra
Department of Zoology

আগুন

ড. জয়দীপ ষড়ঙ্গী
অধ্যক্ষ

গনগনে আঁচের তাপে
ছদ্মবেশী অতীত,
প্রতিবেশী পথ এলোমেলো —
এ সময়ের যৌবন।
পড়িমড়ি করে ডালপালা ধরে
লম্বা বটগাছটায় ঝুলেপড়ায়
ব্যাকুল মন।

অক্টোবর প্রায় শেষ।
ডুলুং হারিয়েছে স্রোত।
সবুজে সবুজে মাদল বাজে
কতসব যাত্রীরা দেখে যায়
লাল মাটির পোড়া ঘর,
সাড়ে তিন শতকের মন্দির
আর,
মানতে, মানতে মেতে ওঠা
জংলী-লতা-মন।

"প্রত্যেক দেশে আগে আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের, পরে গদ্যের।"

— প্রদ্যোৎ বিশ্বাস

অব্যক্ত চেতনা

ড. ভাস্কর ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক
পদার্থবিদ্যা বিভাগ

[নবীনরা থাকে ভবিষ্যতে, মধ্যবয়সীরা বর্তমানে আর প্রবীণরা থাকে অতীতে, স্মৃতিতে। নবীনদের সভায় আমি প্রবীণদের একটা কবিতা পেশ করলাম। আশা করি রসভঙ্গ হবে না।]

কিছু আকাশের কথা বলতে নেই ;
গভীর নিশুতি রাতে,
সবার অগোচরে,
জানালা খুলে
আকাশের তারা দেখি।
ছোটো তারা, বড়ো তারারা ছেয়ে থাকে আমার আকাশ।
এদের ভিতর কেউ কি হাতছানি দিয়ে ডাকে?
'ভালো আছিস্? ভালো?'
দূরবিন এনে বড়ো করে দেখি
চিনতে চাই, চিনতে।
শীতল আকাশ যদি উষ্ণ করে আমার হৃদয়।
কিছু স্বপ্নের কথা বলতে নেই ;
আধোঘুমে দেখা কিছু স্বপ্ন
বাস্তবের মতোই প্রত্যয় এনে দেয়।
জ্যোৎস্নায় স্নাত মাঠ
এখন জনহীন।
সুদূর দিগন্তে সাদা শাড়ী অস্পষ্ট শরীর, অবগুণ্ঠনে ঢেকে কেউ কি
নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে আমার দিকে?
ওদের নিরাশ করতে নেই।
ওদের সত্য বলার দরকার নেই।
চেঁচিয়ে বলি, 'ভালো আছি, ভালো, খুব ভালো।
তোমরাও ভালো থেকো।'

ভালো লাগার তরঙ্গ নাচানাচি করে জ্যোৎস্নাস্নাত মাঠে।
সাদা ঘোড়ার দাপাদাপি জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে
নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে যাই।
কিছু সমুদ্রের কথা বলতে নেই ;
খুব ভোরে জনমানবহীন ঐ সমুদ্রের ধারে,
সারি সারি নৌকার কঙ্কালের পাশ দিয়ে
ছুটে জলে নেমে পড়ি।
কুয়াশায় ঢাকা চাদরে বেশি দূর দেখা যায় না।
আমি অবুঝের মতো চিৎকার করি
'যেও না, তোমরা যেও না..........
এস আমার কাছে, আমার পাশে।
তোমাদের শরীরের দ্রবীভূত ভালোবাসা
সিঞ্চন করুক আমাকে। স্নিগ্ধ করুক মরুভূমি।'
কিচু শৈলচূড়ার কথা বলতে নেই ;
চারিপাশে বরফে ঢাকা উঁচু উঁচু শৃঙ্গ
আমি মাঝে শীতার্ত; উপত্যকায়।
চারিপাশে শীতল বাতাসের গর্জনে কান পাতা দায়।
তবু কি সব কিছু ছাপিয়ে শুনতে পাই :
'আছি, আছি, যাইনি কখনো ছেড়ে।
জেনে রেখো ছায়ার মতো থাকব, সঙ্গে,
অনুভবে কেবল কথা হবে।'
বসন্তে রঙিন ফুলে মোড়া উপত্যকায় আমি শুয়ে থাকি।
মরশুমি পাখিদের কোলাহল আজ ভালো লাগে।

যাযাবর আমি

ড. সুদীপ্ত ঘোষ

অধ্যাপক

রসায়ন বিভাগ

আমি সেই একাই দাঁড়িয়ে আছি,
পাহাড় নদী পার করে ক্লান্ত যাযাবরের মতন।
যার ঘর বাঁধার স্বপ্ন, স্বপ্নে বেঁধে ছিল ঘর,
যা ভেঙেছিল প্রতিদিন ঘুমভাঙার সকালে।
জীবন চলার নেশায় হেঁটেছি পা না গুণে,
তাই দূরত্বটা দূরত্বই থেকে গেছে।
ঝরে পড়ার খেলায় আনন্দ বিলি করি
ওইটুকু সম্বল তার খুঁজে দেয় মানে।
কিবা আসে যায় সে আজ হাসে আমার ডাকে,
কাল সে দুলে যাবে অন্য দোলায়।
মিছে অভিমানে নিজেকে ভাঙি
জানি যেতে হবে ক্লান্ত আমি।
ওই যে হেঁটে যাওয়া মানুষের মাঝে
যদি পারে ছুঁতে মন তারে ক্লান্ত এ শরীর।
সার্থকতার জলছাপা রঙে ভেজে মন,
ফিরে পায় তার ঘর ভাঙার মানে।
যাযাবর আমি ফিরি তার ডাকে ঘরে,
যে করেছে আপন না দেখে আমারে।

বীরসন্ন্যাসী

ড. রূপালি মাজি
অধ্যাপিকা
পদার্থবিদ্যা বিভাগ

লহ মোর প্রণাম হে বীর বঙ্গসন্তান।
ভারতবর্ষের তুমি অমূল্য বরদান।।
১৮৬৩ সনের ১২-ই জানুয়ারি জন্মছিলে তুমি।
ওই দিনটি সাড়ম্বরে করে পালন বঙ্গভূমি।।
তুমি ছিলে মহান বিশ্বনাথ দত্ত ও ভুবনেশ্বরী দেবীর সন্তান।
এরাজ্যে জন্মে পশ্চিমবঙ্গকে করেছ ধন্য, হে বিবেকবান।।
শিকাগোয় মুক্তকণ্ঠে ভারতবর্ষের হয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলে বারংবার।
সেদিনও বিশ্ববাসী, দেশবাসী, রাজ্যবাসী তোমার করেছিল জয়জয়কার।।
সেদিন শিকাগোর বক্তৃতায় করেছিলে অসমুদ্র-হিমাচলের হৃদয়মন্থন।
আজও বিশ্ববাসীর কাছে তা হয়নি পুরাতন।।
শ্রীশ্রী ‘রামকৃষ্ণ’ ঠাকুরের যোগ্য শিষ্য ছিলে তুমি।
তাঁর নামে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ করলে প্রতিষ্ঠা, তাই প্রণমি।।
সেবার দ্বারা উপাধি পেলে তুমি স্বামীজি।
সেই নামে দেশবাসী সর্বত্র তোমায় পুজি।।
ভারতবর্ষের যুবসমাজের প্রেরণা তুমি।
তোমার মতাদর্শ সবাকার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ও দামি।।
তুমি করেছ বহু মানুষের বহু উপকার।
তোমারে জানাই তাই শতকোটি নমস্কার।।

রূপে-অরূপে তুমি

বাপী মজুমদার
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

হে ভাস্কর! জগদ্‌বিখ্যাত তুমি!
পারো না কুঁদে কুঁদে এই পাথরটায়,
আমার একটা রূপ দিতে?
কয়েক নিমেষ মাত্র, গড়ে দাও,
মনোহর এক বিগ্রহ!
অধরে দৃঢ় বিশ্বাসের হাসি ভাস্করের,
পলকেই সৃষ্টি করব তোমায়!
কঠিন শিলা, আমার কল্পনা তো সহজ,
জলবৎ!
গর্বিত হস্ত যন্ত্র তুলে নিল, —
কিন্তু এ কী! সব যেন মিলেমিশে একাকার!
কী রূপ দেব? কেন তা অবয়বে
বাঁধা পড়ছে না!
বৃক্ষের প্রতিরূপে গড়লে প্রাণী,
তবে মূল্যহীন হবে না কি এ ধরাতলে?
কিংবা নর অথবা শুধুই নারী!
কোন্ রূপে প্রতিষ্ঠা চাও তুমি!
হে প্রভু! কোন্ অরূপেই বা
প্রকাশ করব, আমি
জগদ্‌বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ভাস্কর!
রূপের আধারে যে অরূপ তুমি
অরূপেও তুমি রূপবান।
এই যে পাষাণ আমার হাতে,
এও যে তোমারই রূপ, অসীমের আধার,
কেউ পূজে রূপে, কেউ সাধে অরূপে!

অন্বেষা দাশ
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

ইচ্ছে করে

শ্রেয়া ধাড়া
কলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

ইচ্ছে করে...
আমার ইচ্ছে করে অনেক কিছুই।

ইচ্ছে করে পাখির মতো নীল আকাশে উড়তে
আমার ইচ্ছে করে অসীমের পানে ডানা মেলতে।
ডানা মেলে উড়ে গিয়ে
আকাশটাকে ছুঁয়ে দিয়ে
মেঘগুলোকে ধরে নিয়ে
রঙিন ছবি এঁকে দিয়ে
নীল আকাশে ভাসিয়ে ভেলা
আমি মেঘের দেশে হারিয়ে যাব।
তখন কেউ পাবে না আমায় খুঁজে
খুঁজবে আমায় শুধুই মিছে।

ইচ্ছে করে বাতাস হয়ে বইব সারাক্ষণ
আমার ছক-ভাঙা এই পণ।
তপ্ত রোদে গ্রীষ্ম কালে
বইব আমি, মাতব তালে
ভাসিয়ে দেব পৃথিবীকে
কালবোশেখির ঝলকেতে,
মিঠেল হয়ে বইব যখন
পৃথিবীতে শান্তি আনব তখন।
আবার আসব শীতের কালে
ঠাণ্ডা হাওয়ার তালে তালে
হিমেল হাওয়া বইয়ে দিয়ে
হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা নিয়ে
বসন্তে জাগাব জীবন সবার
নতুন বছর আনব আবার।
সব ঋতুতেই আসব ফিরে
সারাবছর বইব ধীরে।

ইচ্ছে করে নদীর মতো স্রোতের বেগে বইব
আর কলধ্বনি তুলব।
নুড়িপাথর জমা করে
নতুন ভূমি তুলব গড়ে,
আবার জলস্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে
নুড়িপাথর ভেঙে নিয়ে
চলব আমি আমার তালে,
ছুটব আমি সাগর পানে।
চলার পথের ধারে ধারে কত দৃশ্য দেখতে পাব,
পথ চলার সেই স্মৃতিগুলো, মনের মধ্যে গেঁথে নেব।
ছুটেই যাব, ছুটেই যাব
সারাটাক্ষণ বয়েই যাব।
যে চলার নেই কোনো শেষ,
তারই সাথে যাব দূর দেশ।।

ইচ্ছে করে ফুলের মতো নানান রঙে ফুটতে,
ইচ্ছে করে পাখির মতো ছোট্টো বাসা বুনতে,
ইচ্ছে করে বৃষ্টি হয়ে অঝোর ধারায় ঝরতে
ইচ্ছে করে সূর্য হয়ে তপ্ত জগৎ গড়তে।

ইচ্ছে করে তুষার-ধবল পাহাড় ডিঙিয়ে চলতে,
ইচ্ছে করে ঝরণা হয়ে বরফ থেকে গলতে
ইচ্ছে করে সবার ব্যথায় করুণ সুরে কাঁদতে
জগৎজোড়া সুরের মায়ায় আনন্দেতে ভাসতে।

ইচ্ছে করে..........
আমার ইচ্ছে করে অনেক কিছুই,
তবু সব ইচ্ছে হয় না পূরণ,
আবার অনেক ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায় —
ইচ্ছে দিয়ে চলে না এই জীবন।
তবু জীবনে ইচ্ছে আসে ফিরে ফিরে
আমার ইচ্ছে করে ভেসে যেতে ইচ্ছেনদীর তীরে।।

> ‘‘ইচ্ছাশক্তি এক সদর্থক এবং সৃষ্টিশীল শক্তি যা আমাদের নির্দিষ্টভাবে সঠিক পথ ধরে চলতে সমর্থ করে।’’
>
> — স্বামী গোকুলানন্দ

বিদায়

সন্তু নেজ
কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন সাম্মানিক

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়,
মৃত্যুতে যাবে মুছে সকল পরিচয়।
এই পৃথিবীর বুক থেকে জানি হারিয়ে যেতে হবে
মিশে যেতে হবে একদিন আকাশের ওই গভীরতায়।
সব হারিয়ে হব আমি একা, যেদিন যাব চলে,
সময় যাবার সাথে সাথে, সবাই যাবে ভুলে।
জানি আমি, ভুলব না এই বিশ্বমাতাকে
আবার যেন ফিরে আসি এই মায়েরই বুকে।
কত কষ্ট, যন্ত্রণা নিয়ে হয়তো যাব চলে,
তবু বলব, থেকো ভালো সকল দুঃখ ভুলে।
অনেক কিছু পাবার ছিল এই পৃথিবীর থেকে —
পাওয়া না পাওয়ার গোলক ধাঁধায় হারিয়ে গেছি নিজে।
সবার কথা পড়বে মনে চলে যাবার ক্ষণে,
হয়তো আমি দোষ করেছি, রেখো না সে সব মনে।
যাবার আগে বলতে চাই, করিও ক্ষমা আমায়,
বিশ্বমাতার চরণ ছুঁয়ে নিতে চাই চিরবিদায়।।

অনুভব

শুভজিৎ দে
কলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ
ইতিহাস সাম্মানিক

চাবুক চালালে লাগে যদি পিঠে
ভাগ্যের ফল তাই লাগে না কো মিঠে।
সুনামি আছড়ে পড়েছে যখন ঘরে, এ সামান্য বর্ষায়
তখন কীসের জন্য পাঠালে তোমরা বর্ষাতি আমায়?

আমি তো আজন্মকাল দেখেছি খরা
অযথা পরিশ্রমে তাই মাটি করেছি উর্বরা।
তুমি ফসল ফলাও তাতে,
আমি কোনোদিন চাইব না তার ভাগ,
তোমাদের তৃপ্তিতে থাক, আমার ভাগ্যবিপর্যয়ের দাগ।

আমায় আরও আঘাত করে তোমরা থাক আলোতে
আমি শুধু রক্তাক্ত হব তোমাদের কথার সুমধুর ছলেতে।

অন্বেষা দাশ
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

‘‘দ্বৈতবাদী সাংখ্যদর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি — প্রকৃতি ও পুরুষ।’’ — ‘সাংখ্য দর্শন’ - অমিত ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব

রামরতন মুখার্জী
বিজ্ঞান বিভাগ, প্রথম বর্ষ
প্রাণীবিদ্যা সাম্মানিক

স্বাধীনতার পর আজ বহু বর্ষ অতিক্রান্ত,
তবুও মানুষ আজও নিষ্পেষিত।।

এই কি তুমি চেয়েছিলে ভারতমাতা,
সহস্র বীর যুবকের রক্তে প্রাপ্ত স্বাধীনতা,
আজ অবহেলিত।।

চরম দুঃসহ যন্ত্রণায় যখন কাতর জন্মভূমি,
একের পর এক নির্যাতিত মাতৃসমা কন্যা,
তখন কোথায় তোমার সেই সাবেকি গর্ব করার বস্তু,
কোথায় তোমার সেই প্রতিবাদী ভাষা, মনুষ্যত্ব।।

যখন, আজও একজন মেয়েকে প্রতিরাতে ভীত হতে হয়,
কখন তার ওপর নেমে আসবে মনুষ্যরূপী, পুরুষরূপী
জন্তুর করাল থাবা,
চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে তার সতীত্ব, নিজের পৌরুষ প্রকাশের জন্য,
তখন কোথায় থাকে তোমার সেকালের গর্ব করার বস্তু,
— মনুষ্যত্ব।।
আজ আমরা স্বাধীন,
সত্যিই কী স্বাধীন?
জানি না!
কারণ, এ প্রশ্নের যে উত্তর নেই।।

বিচিত্র ভারতভূমি, বিচিত্র ভাব।।
যখন, কোথাও একজন পুরুষরূপী জন্তু,
পাশবিক অত্যাচারের পর ছুঁড়ে ফেলে দেয়,
নোংরা আবর্জনার মতো,

ঠিক তখনই,
সীমান্তে কোনো এক পুরুষ, দুর্গারূপে নিমগ্ন থাকে,
শত্রু সংহারে।
স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে।।
কিন্তু সমাজে আজ কোথায় মনুষ্যত্ব,
তা তো আজ বিলুপ্ত।।
আজ কেউ কাওকে ভাবে না ভাই,
তাই, হৃদয়ের মাঝে ক্রমশ জমছে ছাই।।

আজ আত্মীয়তা, মনুষ্যত্ব, পরোপকার,
এরা কি সুপ্ত, না বিলুপ্ত?
উত্তর চাই, তবুও পাই না খুঁজে।।

স্বাধীনতার পর আজ বহু বর্ষ অতিক্রান্ত,
মনুষ্যত্ব, ভালোবাসা সবই অবলুপ্ত।
তবুও আশা রেখে যাই,
রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো কোনো এক সৈনিকরূপে,
যে আবার প্রকাশ পাবে।
ভারতমাতা, তোমার গর্বের মানবিকতাকে, যে তুলে ধরবে বিশ্বদরবারে।
যেদিন আমরা স্বাধীন হব,
যেদিন মনুষ্যত্বকে আবার ফিরে পাব।।
আশা-নিরাশার দোলাচলে কাটবে জীবন,
তবুও আশা রাখি, মানুষ মনুষ্যত্বকে করবে বরণ,
মনুষ্যত্ব, ভালোবাসা, স্বাধীনতার জন্য।।

“স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্বশৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?”
— রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নাবিষ্ট

সন্তু নেজ
কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন সাম্মানিক

হয়তো আমি একটু পাগল,
অল্প বুদ্ধি সহজ-সরল।
না-জানি আমার স্বপ্নগুলো,
হয়তো সবই গল্প ছিল।
তবুও আমি অন্যরকম,
হব না কভু তোমাদের মতন।
একদিন আমি বড়ো হব,
নতুন স্বপ্ন ছড়িয়ে দেব।
যেদিন আমার সব হারাবে—
নতুন কিছু পাওয়া যাবে।
সহসা আমি তোমায় পাব,
সব ফিরে পেয়ে হারিয়ে যাব।
মরুভূমির মরীচিকাসম মোদের এই জীবন,
এ জীবনে আনন্দ আসে স্বল্পস্থায়ী স্বপ্নের মতন।।

মন

শ্রেয়া ধাড়া
কলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

মন বড়ো অদ্ভুত,
কেউ তার হদিশ পায় না বলে,
সে নিজের মর্জি মতো চলে।
শোনে না কারও কথা,
মানে না কোনো বাধা।
চলে সে নিজের মতো,
মানে না নিয়ম সে তো।
কখনও বহুদূর ছুটে চলে যায়,
কখনও বা নিজেকে একলা করে নেয়।
কখনও খোঁজে নির্জনতা,
কখনও বা কোলাহল কিংবা ব্যস্ততা।
কখন যে সে কী চায়!
তার নাগাল পাওয়া বড় দায়।
তাকে বুঝি না আমি
বোঝেন কি অন্তর্যামী?
জানি না সে কথা।
শুধু জানি ব্যাকুলতা!

"যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এইজন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা এক দিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর এক দিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মশককাহিনি

প্রকাশ গায়েন
কলা বিভাগ (সাধারণ)
দ্বিতীয় বর্ষ

একটি মশার সাথে এক সন্ধ্যাতে
হয়েছিল আমার দেখা!
ঠিক ছ'টার সময় আমার জানালাতে
বাক্যালাপ করেছিলাম চোখা।
আমি ডেকে বলেছিলাম তাকে
কোথায় তোমার বাড়ি?
সে বলেছিল জানে না সে —
নাম না-জানা কোন্ সে জলাভূমি,
তাই জন্মস্থানের সঙ্গে তার আড়ি!
দুঃখ তার কেউ কখনো ডেকে বলেনি তাকে
একটু বোসো যেও না চলে!
আমি হেসে বলেছিলাম তাই
কী করে ডাকব তোমায় বলো?
রোগের বাহন যে তুমি
তোমায় রাখলে রোগ ছড়াবে অবহেলে!
অট্টহাসি হেসে মশা তৎক্ষণাৎ দিয়েছিল বলে
তোমাদেরই অসচেতনাতায় জন্ম হয় আমার —
আজ দূরে ঠেললে চলবে কেমন করে?
স্তব্ধবাক হয়ে রয়ে গিয়েছিলাম আমি
অন্ধকারে সাঁতার কেটে গিয়েছিল সে চলে!

''কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:''
— সুকান্ত ভট্টাচার্য

শীতের সকাল

সূর্য চক্রবর্তী
কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ
ইতিহাস সাম্মানিক

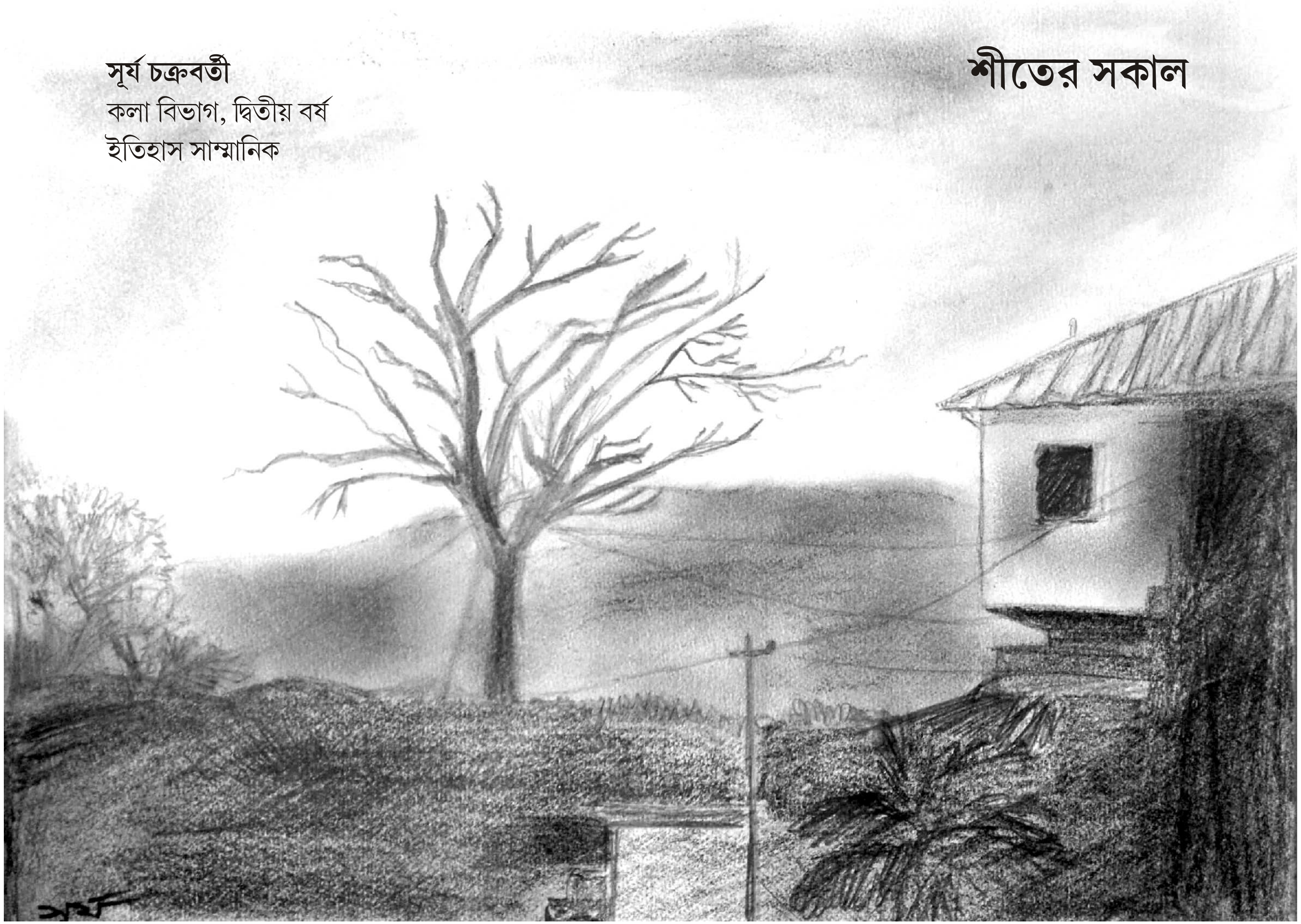

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্র ও সম্পাদক

	পত্রিকার নাম		সম্পাদক
১।	দিগ্‌দর্শন (১৮১৮ খ্রি:, এপ্রিল, মাসিক)	—	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
২।	সমাচার দর্পণ (১৮১৮ খ্রি:, মে, সাপ্তাহিক)	—	জে সি মার্শম্যান
৩।	বাঙ্গাল গেজেটি (১৮১৮ খ্রি:, জুন, সাপ্তাহিক)	—	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
৪।	সম্বাদ কৌমুদী (১৮২১ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫।	ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১ খ্রি:)	—	রামমোহন রায় (শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে)
৬।	সমাচার চন্দ্রিকা (১৮২২ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭।	বঙ্গদূত (১৮২৯ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	নীলরত্ন হালদার
৮।	সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ খ্রি:, সাপ্তাহিক, বারত্রয়িক, দৈনিক, মাসিক)	—	ঈশ্বর গুপ্ত
৯।	জ্ঞানান্বেষণ (১৮৩১ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
১০।	বেঙ্গল স্পেকটেটর (১৮৪২ খ্রি:, দ্বিভাষিক, মাসিক)	—	প্যারীচাঁদ মিত্র
১১।	তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩ খ্রি:, মাসিক)	—	অক্ষয়কুমার দত্ত
১২।	বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১ খ্রি:, মাসিক)	—	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
১৩।	মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪ খ্রি:, স্ত্রী জাতির উন্নতিকল্পে)	—	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
১৪।	এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তাবহ (১৮৫৬ খ্রি:, ৪-ঠা জুলাই)	—	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫।	সোমপ্রকাশ (১৮৫৮ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ
১৬	অবোধবন্ধু (১৮৬২ খ্রি:, মাসিক)	—	বিহারীলাল চক্রবর্তী
১৭।	বামাবোধিনী (১৮৬২ খ্রি:, নারী প্রগতিমূলক)	—	উমেশচন্দ্র দত্ত
১৮।	গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা (১৮৬৩ খ্রি:, এপ্রিল, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক)	—	কাঙাল হরিনাথ মজুমদার
১৯।	অমৃতবাজার (১৮৬৮ খ্রি:, সাপ্তাহিক, দৈনিক)	—	শিশিরকুমার ঘোষ
২০।	অবলাবান্ধব (১৮৬৯ খ্রি:, পাক্ষিক, মাসিক, মেয়েদের জন্য)	—	দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২১।	সুলভ সমাচার (১৮৭০ খ্রি:)	—	কেশবচন্দ্র সেন
২২।	বঙ্গদর্শন (১৮৭২ খ্রি:, মাসিক)	—	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৩।	জ্ঞানাঙ্কুর (১২৭৯ বঙ্গাব্দ)	—	শ্রীকৃষ্ণ দাস
২৪।	সাধারণী (১২৮০ বঙ্গাব্দ, সাপ্তাহিক)	—	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
২৫।	বঙ্গবাসী (১২৮১ বঙ্গাব্দ)	—	যোগেন্দ্রনাথ বসু
২৬।	ভ্রমর (১৮৭৪ খ্রি:)	—	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২৭।	আর্যদর্শন (১৮৭৪ খ্রি:, মাসিক)	—	যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
২৮।	ভারতী (১৮৭৭ খ্রি:)	—	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৯।	সখা (১৮৮৩ খ্রি:, মাসিক, ছোটোদের জন্য)	—	প্রমদাচরণ সেন
৩০।	নবজীবন (১৮৮৪ খ্রি:, মাসিক)	—	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৩১।	প্রচার (১৮৮৪ খ্রি:, মাসিক)	—	রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৩২।	বালক (১৮৮৫ খ্রি:)	—	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
৩৩।	হিতকরী (১২৯৭ বঙ্গাব্দ, পাক্ষিক, দাশহিক)	—	মীর মশারফ হোসেন
৩৪।	সাহিত্য (১৮৯০ খ্রি:)	—	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩৫।	সাধনা (১৮৯১ খ্রি:, মাসিক)	—	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩৬।	হিতবাদী (১৮৯১ খ্রি:, সাপ্তাহিক)	—	কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

সৌজন্যে ঃ বাংলা বিভাগ

অব্যক্ত বেদনা

সন্তু নেজ
কলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ
সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন সাম্মানিক

সত্যিই অবাক লাগছে কথাটা শুনে, যে গাছেরাও কথা বলে! হ্যাঁ, তুমি ঠিকই শুনেছ গাছও কাঁদতে পারে। তবে মানুষের মতো সকলকে শোনাতে পারে না তাদের কান্না। কোলাহলের ভিড়ে, জনতার মিছিলে তাদের আওয়াজ শোনা যায় না ঠিকই, কিন্তু তুমি যদি গভীর রাত্রে নীরবতার চাদর জড়িয়ে প্রকৃতির মাঝে দাঁড়াও তাহলে তুমিও শুনতে পাবে গাছেদের না-বলা কথাগুলো, কষ্টগুলো। যেন তাদের মনে জমে থাকা সব যন্ত্রণা, সব অভিযোগ তারা বলে দিতে চায়। যদিবা সেই অভিযোগ শোনার জন্য আমরা কেউ বসে থাকি না। নিজেদের পরিবারের সাথে তারাও একটু একটু করে বড়ো হতে হতে কখন যে হারিয়ে যায় তারা নিজেরাও তা জানে না। গভীরে ভাবলেই বোঝা যায় যে সবই প্রকৃতির খেলা! এমন কিছু প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমরা খুঁজি না, খোঁজার চেষ্টাও করি না। আচ্ছা বলো তো, একটা শিশুকে বেঁচে থাকতে হলে তিনটি গাছের যদি দরকার হয় তাহলে একটি গাছকে বেঁচে থাকতে একজন মানুষের দরকার কেন হবে না? দরকার হয়, কিন্তু আমরা অত গভীরে ভেবে দেখি না। সময়ের স্রোতে, জীবনের খেলায় প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই সর্বদা গতিশীল। সকলের মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্ক বর্তমান। কিন্তু আমাদের কারোর হাতে একটুও সময় থাকে না গাছের কথা শোনার, তাদের অভিযোগগুলো শোনার। তাইতো আজ তারা বড্ড বেশি অভিমানী হয়ে উঠেছে। গুমরে গুমরে কাঁদছে, কিন্তু তারা উচ্চস্বরে চিৎকার করছে না। একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে নির্বাকের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিরত। তারা যাচ্ছে না কোনো প্রশাসনিক কার্যালয়ে তাদের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য।

আজ তারা খুব অসহায় নিজেদের জীবন বাঁচানোর লড়াইয়ে। তুমি কী কখনও অনুভব করেছ যখন একটা গাছকে কাটা হয়, তখন কত বেদনা তাদের সহ্য করতে হয়? তবু তারা কোনো প্রতিবাদ করে না অমানবিক মানুষের অমানুষিক আচরণের বিরুদ্ধে। তারা বের করে না কোনো ঝাণ্ডাধারী মিছিল তাদের কষ্ট কমানো জন্য। তাদের মধ্যে যেন রয়েছে অসীম সহনশীলতা। আচ্ছা একটা কথা বলো তো, আমরা কি পারি না তাদের কষ্ট কমাতে? আমরা কি পারি না তাদের যন্ত্রণাগুলো দূরে সরিয়ে দিতে? হ্যাঁ পারব। একটু কষ্ট করলেই আমরা সকলেই পারব। যেদিন পারব সেদিনই গাছেদের না-বলা কথাগুলো আমরা শুনতে পাব। সেদিন গাছের ছত্রছায়ায় গিয়ে তাদের আঁকড়ে ধরে বলতে পারব গাছ তোমারও জীবন আছে, সেদিনই মানুষের মানবিকতার প্রকাশ ঘটবে। পৃথিবী আবার শ্যামলিমায় ভরে উঠবে। আশা রাখি সেই দিনটা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসুক আমাদের জীবনে। হয়তো সেদিন আমরা সকলে মাথা উঁচু করে বলতে পারব — 'বন্ধু তোমাদের ছাড়া আমরা বাঁচব কী করে?'

রিম্পা মুদী
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

সার্ধ শতবর্ষে প্রমথ চৌধুরী

ড. শিতি কুমারী কুণ্ডু
অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ

> **"প্রমথ চৌধুরী সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রযুগের লেখক হইয়াও নিজের মানস ও রচনাস্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট, রবীন্দ্র প্রভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন নন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সবুজপত্রের মাধ্যমে চলিত ভাষাশ্রয়ী বুদ্ধিপ্রধান, আঙ্গিকসচেতন প্রবন্ধের যে ধারা প্রবর্তন করেন, রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙলা প্রবন্ধের রূপ-নির্মিতিকে তাহা গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।"**
>
> **— ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য**

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা প্রবন্ধকে যিনি নতুন মেজাজ ও ভঙ্গির বাহন করে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন, তিনি হলেন প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী। তাঁর অধিকাংশ রচনা — ছোটোগল্প, অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, এমনকি কাব্য পর্যন্ত প্রবন্ধধর্মী। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে মজলিশি মেজাজ, খেয়াল-খেলার লীলায়িত ছন্দ এবং ভারমুক্ত মনের স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে কোথাও হালকা চাল থাকলেও তাঁর আলোচনা গাম্ভীর্যপ্রধান ও গভীর সুরে অনুরণিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ মাঝে মধ্যে গীতি কবিতার গদ্যরূপ, ভাষায় ও ভাবে একান্তভাবে কাব্যধর্মী, আবার কখনওবা ক্ষুরধার যুক্তিপ্রয়োগে শাণিত খড়্গের ন্যায় দীপ্ত। প্রমথ চৌধুরী উইট বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, নির্মল পরিহাস, বুদ্ধিদীপ্ত রসকৌতুক ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছিলেন।

১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ৭-ই আগস্ট যশোর-এ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের জমিদার বংশের সন্তান। মাতা হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর দ্বিতীয় কন্যা সুকুমারী দেবী। তাঁর পৈত্রিক ভদ্রাসন পাবনা জেলার হরিপুর গ্রাম, মানসিক গঠন ও ভাষা কৃষ্ণনগরের। কৃষ্ণনগরই তাঁর সাংস্কৃতিক জীবনের ভূমিকা রচনা করেছিল। কৃষ্ণনগরই তাঁকে দিয়েছিল ভাষা ও রূপজ্ঞানের মন্ত্র। তাই পরিণত বয়সে বারংবার নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। আর সাধনপীঠ ছিল কলকাতা। তাঁর ভ্রাতারা হলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, কুমুদনাথ চৌধুরী এবং অমিয় নাথ চৌধুরী।

উদার ও সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন তিনি; ছিল না কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা। তিনি ছিলেন গ্রন্থকীট। তাঁর পিতার ছিল ইংরেজি বই-এর একটা বিরাট সংগ্রহ। এই গ্রন্থাগারের আনুকূল্যে ছোটোবেলা থেকেই প্রমথ চৌধুরী ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি নিজেই একটি লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিলেন ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যের। ছোটোবেলা থেকে অনেক বাংলা গ্রন্থও অধ্যয়ন করেছিলেন

— যেমন বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', কৃষ্ণচন্দ্রের 'বাংলার ইতিহাস', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী - মৃণালিনী - বিষবৃক্ষ - কপালকুন্ডলা', নবীন চন্দ্র সেন-এর 'পলাশীর যুদ্ধ', কালী সিংহের 'মহাভারত' ইত্যাদি। পিতৃবংশে কোনোরকম সংগীতচর্চা না থাকলেও মাতৃসূত্রে প্রমথ চৌধুরী সংগীতপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে এসে তাঁর সেই সংগীতানুরাগ দৃঢ়তর হয়েছিল।

ছাত্র হিসেবে প্রমথ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত কৃতী। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণিতে বি.এ. পাশ এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ পাশ করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত রওনা দিয়েছিলেন পথে রাত্রিবেলা চোখে পড়েছিল প্যারিসের রাজপথে আলোর মিছিল; বৃদ্ধ বয়সেও সেই আলোর ছবি তাঁর দৃষ্টি থেকে অপসারিত হয়নি। এক সময়ে গিয়েছিলেন ইতালি। মিলানে দেখেছিলেন স্থাপত্যশিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন। ভালো লেগেছিল ভিনিস। রোমের আর্ট ও এঞ্জোলোর ছবি তাঁর মনোহরণ করেছিল। বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) বিলেতে ঘুরেছিলেন অনেক, দেখেছিলেন প্রচুর — কিন্তু নির্বিচারে সব কিছু মনের মধ্যে গ্রহণ করেননি। ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বেশি দিন ব্যারিস্টারি করেননি। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এরপর কিছুদিন আইন কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। কিছুদিন ঠাকুর এস্টেট ও দক্ষিণেশ্বরের দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' ছদ্মনাম গ্রহণের পশ্চাতে যতটা না ছিল খেয়াল তার চেয়েও বেশি ছিল বিশেষ ধরনের মনের গড়ন। তাঁর প্রকৃতির মধ্যে মধ্যযুগের সভাসদসুলভ বৈশিষ্ট্য ছিল। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, মজলিশি মন, অভিজাত মানসিকতা — সমস্ত কিছু মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্যের রেশ যেন তাঁর মনের গড়নে ও বলার ঢংয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আকবরের সভার অন্যতম সভাসদ সুরসিক বীরবলের ওপরে তাঁর আকর্ষণ ছিল বাল্যকাল থেকেই। সম্ভবত বীরবলের সভাসদ্ হওয়া ও রসিকতার ছলে সত্যভাষণ-এর কারণেই তাঁর প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্যে সুপন্ডিত প্রমথ চৌধুরী ছিলেন বহুপঠনশীল সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অবদান হল ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে 'সবুজপত্র' নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করে সাহিত্যে অভিনব রচনাভঙ্গির প্রবর্তন করেছিলেন এবং সাহিত্যে চলিতভাষাকে মর্যাদা দান করেছিলেন। তিনিই প্রথম স্যাটায়ারিস্ট বা বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাত হলেও কবিতা এবং গল্পও রচনা করেছিলেন। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' পদক প্রদান করেছিল। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গিরিশ ঘোষ' বক্তারূপে তাঁর ভাষণে বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর কাব্যপ্রতিভা খুব বড়ো নয়, কারণ তাঁর প্রতিভা মূলত গদ্য রচনার। তাঁর সমৃদ্ধ গদ্য রচনার নীচে কবিপ্রতিভা অনেকটাই চাপা পড়েছে, আর সেকারণেই তাঁর কবিপ্রতিভার আলোচনা খুব বেশি হয়নি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩ খ্রিঃ) এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'পদচারণা' (১৯১৯ খ্রি:)। 'সনেট পঞ্চাশৎ' পঞ্চাশটি সনেটের সংকলন যেখানে তিনি সনেট আঙ্গিকে এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ফরাসি রীতির সনেট তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় নিয়ে এসেছিলেন। 'পদচারণা'র বেশিরভাগ লেখাই কবিতা-কৌতুক, দু-চারটি সিদ্ধ সনেট। মুষ্টিমেয় কবিতার রচয়িতা হলেও নব সম্ভাবনার পথিকৃৎ তিনি। 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর সমস্ত সনেটগুলোই ফরাসি সনেটের রীতিতে লেখা; কিন্তু 'পদচারণা'-এর কয়েকটি সনেট ইতালীয় সনেটের পদ্ধতিতে লেখা। তিনি সনেট বিন্যাসে রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখের ন্যায় অষ্টাদশ-মাত্রিক চরণ ব্যবহার না করে মধুসূদনীয় আদি সনেটের চতুর্দশ-মাত্রিক চরণ বিন্যাসকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। শেকসপিরীয় রোমান্টিক উন্মাদনা, মিল্টনীয় উদাত্ততা, রাবীন্দ্রিক কল্পনাবিস্তার, রসেটি সুলভ বর্ণাচিত্রণের পরিবর্তে বাক্চাতুর্য, পরিহাস রসিকতা ও শ্লেষাত্মক রীতি প্রমথ চৌধুরীর সনেটের বাহন। তাঁর সনেটের ভাবরূপ স্থিতিশীল নয় — গভীর থেকে তরলে আসা, তুচ্ছতাকে অসাধারণ করে তোলা — প্রমথ চৌধুরীর প্যারাডক্স প্রবণতারই পরিচয়বাহী।

তাঁর রচিত কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল 'চার ইয়ারির কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' প্রভৃতি। গল্পগুলো আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁত হলেও এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশভঙ্গিমা ছোটোগল্পের রূপ ও রীতিকে পূর্ণ শিল্পরূপ দিতে পারেনি। তাঁর গল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে আলাদা রীতির। প্রমথ চৌধুরীর গল্প হল মজলিশি খোশ গল্প, তাঁর প্রবন্ধ হচ্ছে মজলিশি আলোচনা। মজলিশি আলোচনা বা গল্প বস্তুত কোনো নিয়ম মেনে চলে না। সেখানে পদে পদে নানা কূট তর্ক, তীক্ষ্ণ মন্তব্য, অকারণ উক্তি স্থান পাওয়াই স্বাভাবিক। আর এধরনের অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার মধ্যে মননধর্ম ও উইট-এর খেলা দেখানোর একটা সুযোগ প্রমথ চৌধুরী দেখতে পেয়েছিলেন। আর একারণেই 'ছোটোগল্প' নামক গল্পের প্রথম দিকে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অহেতুক আলোচনা করা হয়েছিল। 'ফরমায়েসি' গল্পের কাহিনি পদে পদে বক্তা ও শ্রোতাদের অবান্তর তর্ক-বিতর্কের দ্বারা কণ্ঠকিত। 'আহুতি' গল্পে রুদ্রপুরের ধ্বংসকাহিনির আগে যে দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনি বিবৃত হয়েছে তা গদ্যশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেও গল্পের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভা মননধর্মী, তাঁর সমস্ত রচনাই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। একারণেই তাঁর গল্পগুলো অনেকটা প্রবন্ধধর্মী। অধিকাংশ গল্পেই আরম্ভ দেখে ঠিক বোঝা যায় না, রচনাটি প্রবন্ধ না গল্প।

কবিতা, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ — প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীকে মূলত এই তিনটি ভাগেই ভাগ করা যায়। কিন্তু রচনাপরিধির দিক থেকে তাঁর প্রবন্ধ অন্য দুটো বিভাগকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধের গঠনগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধতা থেকে মুক্ত। 'প্রবন্ধ' নামের মধ্যে যে প্রকৃষ্ট বন্ধনের ইঙ্গিত আছে, তাকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রবন্ধের

শিরোনামেতে যে বিষয় অনুসরণের প্রতিশ্রুতি আছে, তা তিনি পূরণ করেন অত্যন্ত পরোক্ষভাবে; নানা পথ পরিক্রমার পর, নানাবিধ অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপনের পর। দেশি, পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সংগীততত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা — এমন কোনো বিষয় নেই যার সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারা, প্রকাশচাতুর্য অনুপম সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠেনি। লঘু-তরল ব্যঙ্গ, খেয়ালি বিচরণের আড়ালে তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করতেন। তাঁর প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতুলচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য —

> ''প্রবন্ধগুলিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আহ্বান, উপদেশ ও আচরণে প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি।''

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থ হল —'তেল নুন লকড়ি' (১৯০৬ খ্রি:), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭ খ্রি:), 'নানা কথা' (১৯১৯ খ্রি:), 'আমাদের শিক্ষা' (১৯২০ খ্রি:), 'দু-ইয়ারকি' (১৯২১ খ্রি:), 'বীরবলের টিপ্পনী' (১৯২১ খ্রি:), 'রায়তের কথা' (১৯২৬ খ্রি:), 'নানা চর্চা' (১৯৩২ খ্রি:), 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' (১৯৪০ খ্রি:) ইত্যাদি।

প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪ খ্রি:) পত্রিকার মাধ্যমেই সাধুভাষা ও চলিতভাষার মধ্যে দীর্ঘ বিরোধের একটি মীমাংসা সম্ভব হয়ে উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কথ্যভাষাকে সাহিত্যিক কৌলীন্য দেওয়ার যে প্রচেষ্টা চলছিল তার প্রাচীনতম সাহিত্যিক নমুনা হল 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৮৫৪ খ্রি: 'মাসিক' পত্রিকা নামে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছিল — 'যে ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক।' কিন্তু সেসময় সাহিত্যে মৌখিক ভাষা ব্যবহারের সমস্ত প্রচেষ্টাই ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; উপরন্তু মৌখিক ভাষাকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে তুলে যথার্থ সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা তখন দেখা যায়নি; কারণ সময়টা তখন অনুকূল ছিল না। কিন্তু 'সবুজপত্র'র যুগে মৌখিক ভাষার ভিত্তিতে সাহিত্য রচনার ব্যাপক প্রয়াস শুরু হয়েছিল। একারণেই 'মাসিক' পত্রিকার চেয়ে 'সবুজ পত্র'র ভাষা-আন্দোলন ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে মৌখিক ভাষা যে সাধুভাষার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে — তার পশ্চাতে রয়েছে 'সবুজপত্র' পত্রিকার অনবদ্য ভূমিকা।

'সবুজপত্রে'ই গদ্যের আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ঋজু অথচ সরস গদ্যের জনক তিনি। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'ল্যাবরেটরি', 'রবিবার' প্রভৃতি গল্পে এই গদ্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই গদ্য কথ্যরীতিতে গঠিত ছিল। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সতীশচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রিয়ম্বদা দেবী প্রমুখ লেখকলেখিকারা 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ঝরঝরে সাবলীল গদ্য লিখতেন। আর এভাবেই 'সবুজপত্র' বীরবলী যুগ ও বীরবলী চক্র সৃষ্টির মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে জীবনীশক্তি দিয়েছিলেন, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও তা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু গদ্যচর্চা বিবেকানন্দর পরিপূর্ণ মনোযোগ পায়নি; প্রমথ চৌধুরী জীবনের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ গদ্যচর্চায় আরোপ করেছিলেন। ফলে বিবেকানন্দে যা ইঙ্গিতমাত্র, বীরবলে তা ফলবান। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যকে 'ইস্পাতের ছুরি' বলে অভিহিত করেছিলেন। কালের বিচারে প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রযুগের সাহিত্যিক, কিন্তু সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তাঁকে 'রবিচক্রের' অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও অতি নিকট আত্মীয় হয়েও তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। এভাবেই 'সবুজপত্র'র নিশান উড়িয়ে বাংলা বাক্যাধিপের 'দুয়োরানি'কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যিনি, বাংলা সাহিত্যের সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অবশেষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২-রা সেপ্টেম্বর নির্বাপিত হয়েছিলেন। আজ সার্ধ শতবর্ষে বাংলা সাহিত্যাকাশের এই ধ্রুবতারাকে সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করি।

> "রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলা বাক্যাধীপেরও আছে দুই রানী — একটাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা ; আর-একটাকে কথ্য ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, ... কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে।"
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : শতবর্ষের আলোকিত প্রান্তরে

ড. নির্মাল্য মন্ডল
অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়! বাংলা সাহিত্যে বিশ শতকের কালপর্বে বৈদগ্ধ্য আর রসবোধের সমবায়ে যেসব সাহিত্যিক তাঁদের মৌলিক সৃজনশীলতা দিয়ে অবিরাম আলো ছড়িয়ে গিয়েছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতেই উচ্চারিত হবে। প্রকৃত অর্থেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে গত শতাব্দীতে বহুমাত্রিক বাঙালি প্রতিভাধর লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব।

১৩২৫ বঙ্গাব্দে (৪-ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯১৮) বাংলাদেশের দিনাজপুরের বালিয়াডিঙিতে তাঁর জন্ম। পূর্বপুরুষের আদি বাসভূমি ছিল বরিশাল জেলার নলচিরায়। ভাই-বোনেদের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণের মতো কংসবধের দায়িত্ব হয়তো তাঁকে নিতে হয়নি, কিন্তু তাঁর হাতের কলম অন্য স্থানে অভূতপূর্ব শক্তির স্মারক হয়ে উঠেছে। গভীর প্রজ্ঞা, শাণিত দৃষ্টি এবং অনন্য কৌতুকের অবিরাম বিচ্ছুরণে তিনি সমাজ ও মানুষের বহু দুর্ভেদ্য জটিলতাকে অনায়াসে ভেদ করে গেছেন। দিনাজপুরে আত্রাই নদীর তীরে কাটিয়েছিলেন ছেলেবেলার মধুর স্মৃতিমাখা দিনগুলি। প্রকৃত নাম ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কিন্তু ডাকনামেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন, অতঃপর সেই নামটিই স্বক্ষেত্রে তাঁকে প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি দিয়েছে। স্কুলজীবনে মেধাবী ছাত্র বলে তাঁর খ্যাতি ছিল; সেই সুখ্যাতি নিয়েই ফরিদপুরের ব্রজমোহন কলেজে পড়াশোনা; পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র নারায়ণ স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। উত্তরকালে পেশাগত জীবনেও তিনি সমান যশস্বী হয়েছিলেন। জলপাইগুড়ির আনন্দমোহন কলেজ ও কলকাতার সিটি কলেজে প্রথমে অধ্যাপনা শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের খ্যাতিমান বহু উজ্জ্বল অধ্যাপকদের মধ্যে তিনিও হয়ে ওঠেন অন্যতম। সেই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগ স্মরণীয় বহু পন্ডিত ও সাহিত্যিকদের সমাগমে হয়ে উঠেছিল বঙ্গসংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান স্বরূপ। উত্তরকালের বহু খ্যাতিমান অধ্যাপক তাঁর হাতে গড়া ছাত্র ছিলেন। অনেকের স্মৃতিচারণাতেই উঠে এসেছে তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বরের বিশ্লেষণী আলোচনা শুনতে — এমনকি অন্য বিভাগের ছাত্র-সমাগমে কীভাবে বাংলা বিভাগের কক্ষে ভিড় উপচে পড়ত। এই পর্বেই ছোটোগল্প নিয়ে তাঁর গবেষণা গ্রন্থ তাঁকে ডি.লিট. উপাধি এনে দেয়। কর্মরত অবস্থাতেই ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে (৬-ই নভেম্বর, ১৯৭০) মাত্র বাহান্ন বছরেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে।

শৈশব-কৈশোরের আত্মকথায় নারায়ণ তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলির কথা উল্লেখ করছেন। এখানেই একজন অনুভূতিসম্পন্ন লেখকের বেড়ে ওঠার দিনগুলির ছবি মিলবে। তাঁর বাবা ছিলেন সেই আমলের নামজাদা

পুলিশের দারোগা। সুপুরুষ সংযমী নিষ্ঠাবান মানুষটির আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব অল্প বয়স থেকেই তাঁকে মুগ্ধ করত। কর্মক্ষেত্রের বাইরে তাঁর একমাত্র শৌখিনতা, অবসরযাপন, বিনোদন বলতে ছিল বই পড়া। ডাকাত ধরে এসে বাড়ি ঢুকেই খোঁজ নিতেন অর্ডারি নতুন বই এসে গেছে কিনা। বাড়ির বিরাট গ্রন্থাগারে ছিল দেশি-বিদেশি বিচিত্র বইয়ের সম্ভার। বাংলাদেশের সব রকম দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা বাড়িতে নিয়মিত আসত, বাদ যেত না ছোটোদের পত্রিকাও। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি অনর্গল মিল্টন, স্টুয়ার্ট মিল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেক্সপিয়রের থেকে নির্ভুল মুখস্থ বলে যেতেন তিনি; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই উল্লেখ করছেন যে, বাবার কাছ থেকেই সাহিত্য সম্পর্কে গভীর অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন, সাহিত্য রচনার পরোক্ষ প্রেরণাও। তবে মায়ের থেকে সম্ভবত পেয়েছিলেন নীরব সাধনা আর আত্মস্থ স্বভাবটি। বাড়িতে তাঁর মায়ের উপস্থিতি কেউ টের পেত না, অথচ সেকালের বৃহৎ পরিবারের পুরো সংসারটির কর্মযজ্ঞ সামলাতেন -- নীরবেই। খুব অল্প বয়সেই তিনি মাকে হারিয়েছিলেন; ছেলেবেলার সেই বেদনা তাঁর ছোটো হাতের অক্ষরে রূপ পেয়েছিল — 'ঘুম ভাঙা সেই ভয়ের মাঝে তখন খুঁজি কাকে? / ছোট্টোবেলায় হারিয়ে যাওয়া সেই যে আমার মাকে।'

মায়ের নিরালা স্বভাব বর্তেছিল নারায়ণের মধ্যেও। বাড়ির বারান্দায় ভাঙা প্যাকিং বাক্স আর স্তূপীকৃত কাঁঠালের ওপরে ছিল তাঁর সাহিত্যের সাধনআশ্রম। নিজের লেখা নিজেই পড়তেন এবং ছিঁড়ে ফেলতেন। 'চিত্র-বৈচিত্র্য' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকাও সেই বালক বয়সে প্রকাশ করে ফেললেন। ভরসা করে 'ডাক' নামে একটি কবিতা পাঠান তখনকার নামকরা 'মাসপয়লা' পত্রিকায়; বছর দশেক বয়সে লেখা সেই কবিতাই তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা; 'ডাক' নামের কবিতাটির কয়েকটি লাইন এইরকম -- 'ঘরের কোণে থাকতে বসে / চায় না যে আজ মন, / হাতছানি দে' ডাকে আমায় / মাঠ ঘাট পথ বন।' এটি লিখে ছোটোদের বিভাগে তিনি পুরস্কারও পান। অল্পবয়সের সেই সাহিত্যসাধনার মধ্যে এক সময়ে প্রবেশ করল রাজনীতি। ব্রিটিশ আমলে নিষিদ্ধ বইপত্র রাখবার জন্য থানায় নিয়ে গিয়ে পিটিয়েও পুলিশ কোনো কথা বের করতে পারল না। বাবা ইংরেজ সরকারের রক্ষকের পদে থেকেও ব্রিটিশবিরোধী কাজে বাধা দেননি।

আবার সন্তানকে তিনি নিজের পদের কর্তৃত্ব দিয়ে বাড়তি সুরক্ষাও দিতে চাননি। আপন অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর সন্তান আপনিই বেড়ে উঠুক এমনটাই তাঁর বাবা চেয়েছিলেন। বড়ো তিনি হয়েও উঠছিলেন ক্রমশ; আর এই সবের মধ্যেই চলছিল তাঁর লেখালেখি। ততদিনে 'দেশ' পত্রিকার পাতায় তাঁর কবিতার নিয়মিত প্রকাশ শুরু হয়েছে। তখন তিনি সবেমাত্র কলেজের ছাত্র। এই সময়েই 'দেশ' পত্রিকার সহসম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উৎসাহে তিনি দেশের জন্য লিখে ফেললেন একটি গল্প — 'নিশীথের মায়া'। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প। এভাবেই আত্মপ্রকাশ এবং উত্থানের সূচনা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'উপনিবেশ'। যদিও 'তিমিরতীর্থ' উপন্যাসটি তিনি প্রথম লিখেছিলেন। প্রথিতযশা এই সাহিত্যিকের বিপুল রচনাসম্ভারের দিকে এক ঝলক দৃষ্টিপাত করা যাক। কবিতা রচনা দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু হলেও উত্তরকালে

কথাসাহিত্যিক হিসেবেই তিনি বেশি খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তাঁর অজস্র উপন্যাসের মধ্যে তিমিরতীর্থ, উপনিবেশ, কৃষ্ণপক্ষ, লালমাটি, পদসঞ্চার, নিশিযাপন, কৃষ্ণচূড়া, মেঘের উপর প্রাসাদ, নিশিযাপন, নির্জন শিখর, অমাবস্যার গান, আলোকপর্ণা, তিন প্রহর, সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী, নতুন তোরণ, সন্ধ্যার সুর, বনবাংলো, শিলালিপি, মন্দ্রমুখর, অসিধারা প্রভৃতির নাম করা যায়। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত ছোটোগল্পগুলির অনেকগুলিই গ্রন্থভুক্ত হয়েছে ট্রফি, বীতংস, গন্ধরাজ, মেঘরাগ, শুভক্ষণ, শিলালিপি, ভাঙ্গাবন্দর, ভাটিয়ালী, ঘূর্ণী ইত্যাদি গল্পগ্রন্থে। মনীষার অন্য মহলেও তাঁর যাতায়াত ছিল অবাধ। তাঁর বহুখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ , সাহিত্যে ছোটোগল্প, ছোটোগল্পের সীমারেখা, বাংলা গল্পবিচিত্রা, সাহিত্য ও সাহিত্যিক গ্রন্থগুলি বিদগ্ধমহলে অদ্যাবধি প্রবল জনপ্রিয়।

জন্মসূত্রেই তাঁর নাকের ওপর একটি চশমা পড়ার মতো দাগ ছিল; তাই ঠাকুমা তাঁকে বলতেন ‘পুঁথি পড়া পন্ডিত’। অভিধাটি তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি পরিচয় রয়েছে; তিনি শুধু নামজাদা অধ্যাপক নন; তাঁর অনুশীলিত মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেও তিনি কেবলমাত্র বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক নন, তাঁর গৌরব একমাত্র বড়োদের জগতের সাহিত্যচর্চায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করার সাফল্যেও সীমায়িত নয়, তিনি শিশু-কিশোর সাহিত্যেও এক জনপ্রিয় নাম। তাঁর ধী-শক্তি, নিরলস জ্ঞানের চর্চা তাঁকে নিছক পান্ডিত্যের কোঠায় বেঁধে রাখতে পারেনি। বরঞ্চ তাঁর সৃজনশীলতার মধ্যে প্রজ্ঞার ঝিকিমিকি আলোর সঙ্গে একপ্রকার কৌতুকের সরস প্রভা ছড়িয়ে থাকত। আর এই মেজাজ নিয়েই নারায়ণ ছোটোদের জন্য কলম ধরেছিলেন। ছেলেমানুষের সঙ্গে যেমন মিশতে হয় ছেলেমানুষ হয়েই, তেমনভাবেই ছোটোদের পৃথিবীকে তিনি তাদের দৃষ্টি দিয়েই দেখেছিলেন। তাই কিশোর পাঠকের কাছে তিনি এতখানি আপনজন। তাঁর সৃষ্ট পটলডাঙ্গার ‘টেনিদা’ চরিত্র বাংলা কিশোর সাহিত্যে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে। কিছু কম অনবদ্য নয় টেনিদার চ্যালারা তথা ক্যাবলা, হাবুল আর প্যালারাম। চারমূর্তি, চারমূর্তির অভিযান, ঝাউ রহস্য, কম্বল নিরুদ্দেশের মতো তাঁর টেনিদাকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলির বাইরে আরও কিছু কিশোর উপন্যাসের অন্যতম হল জয়ধ্বজের জয়রথ, অন্ধকারের আগন্তুক, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, রাঘবের জয়যাত্রা, পঞ্চাননের হাতি। তাঁর অজস্র ছোটোগল্পগুলির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শৈশব-কৈশোরের টুকরো টুকরো উপাদেয় আনন্দ অনুভূতি। গজকেষ্টবাবুর হাসি, ঘোড়ামামার অবদান, বনভোজনের ব্যাপার, পেশোয়ার কী আমীর, প্রভাত সঙ্গীত, একাদশীর রাঁচিযাত্রা, ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন, ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ — এমন কত রচনা ছোটোদের মতো বড়োদেরও অনাবিল আনন্দে সিক্ত করে। তাঁর লেখা কিশোরদের উপযোগী কিছু নাটকের অন্যতম ---- ভাড়াটে চাই, টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক, বারো ভূতে, বিশ্বকর্মার ঘুড়ি, ভীমবধ,পরের উপকার করিও না। এর বাইরে তিনি চলচ্চিত্রের জন্য কিছু চিত্রনাট্যও লিখেছেন, রচনা করেছেন কিছু গানও। পাশাপাশি সাংবাদিক ও সমালোচকের ভূমিকাতেও তিনি সফল। কথাশিল্প গল্প প্রতিযোগিতায় তিনি পুরস্কার পান। বসুমতী সাহিত্য পত্রিকার তরফে সংবাদ-সাহিত্যের জন্য তাঁকে পুরস্কৃতও

করা হয়। ১৯৬৪ সালে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর অবদানের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক দিয়ে মরণোত্তর সম্মানে ভূষিত করে। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সুনন্দ ছদ্মনামে দেশ পত্রিকায় 'সুনন্দর জার্নাল' নামক রম্যরচনা লিখে পাঠকের কাছে প্রভূত সমাদৃত হন। উত্তরকালে তাঁর রচনা চলচ্চিত্রায়িতও হয়েছে। এর মধ্যে নিশিযাপন এবং দামু (ছোটোদের চলচ্চিত্র) উল্লেখ্য।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের বহুমাত্রিকতার সামান্য একটি আভাসমাত্র এখানে উল্লেখ করা হল। তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণের পরিসর বা অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু শতবর্ষে সমুপস্থিত এই সাহিত্যিকের উপযুক্ত মূল্যায়নের এখনও অনেক বাকি রয়েছে। গত শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের মানচিত্র — তার নাগরিকতা, রাজনৈতিক সঙ্কট, আর্থ-সামাজিক ঘোলাটে পরিস্থিতি, বৈপ্লবিক মানসিকতা, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, আর এরই মধ্যে পড়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নানা ধরনের আত্মজিজ্ঞাসায় আলোড়িত চেতনাকে তিনি তাঁর লেখায় ধরতে চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে পরিশীলিত চৈতন্যের অন্তর্লীন রোমান্সকেও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় অস্বীকার করতে পারেনি। অধ্যাপনার সূত্রে বঙ্গজীবনের মননশীলতার উত্তরাধিকারটিকেও তিনি সার্থকতার সাথে ধারণ করেছিলেন। আবার সেই মানুষটিই যখন কৈশোরের আঙিনায় নেমে এসেছেন তখন তাঁর সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধির ভারিক্কি পোশাকটিকে অনায়াসে খুলে রেখে তিনি হয়ে উঠেছেন ছোটোদের মতোই ভারমুক্ত জগতের অধিবাসী। গত শতকের বাঙালির সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশের একটি পরিপূর্ণ অধ্যায়কে তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর বাঙালির দায়িত্ব সেই অধ্যায়টিকে রক্ষায় ও আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় যত্নবান হওয়া ---- এবং আগামী শতাব্দীরও .....।

১২৫তম বর্ষে শিকাগো বক্তৃতা ও স্বামী বিবেকানন্দ

রঞ্জনা মন্ডল
অধ্যাপিকা
ইতিহাস বিভাগ

> "বিবেকানন্দ কেবল একটি ব্যক্তি নন, তিনি ভারতবর্ষের আত্মার অভিব্যক্তি, যা অভিভূত করেছে সারা বিশ্বকে — বিরাট অভিনব প্রতিষ্ঠান তিনি।"
>
> — বনফুল

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে, পরশাসিত পতিত জাতির অধঃপতনের চরম অবস্থায় — সন্ন্যাসের মহাবীর্যকে আশ্রয় করে যে মহাপুরুষ ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সমষ্টিমুক্তির মহান আদর্শ প্রচার করে গেছেন তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ। 'বিবেকানন্দ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ — 'যে পূর্ণ বিবেক সদা আনন্দময়'। অতি অল্প সময়ের বিস্তৃতিতে তিনি ভারতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাঁর মহিমময় দীপ্তি বিশ্বজগৎকেও উদ্ভাসিত করেছিল।

মানবজাতির ইতিহাসে একটি শতাব্দী খুব একটা সুদীর্ঘ সময় নয়। অনন্তকালের সমুদ্রে শতাব্দী একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গবিন্দু। আজ একবিংশ শতাব্দীর যে ক্ষণে আমরা অবস্থান করছি অর্থাৎ ২০১৮ সাল তা ভারত ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বছর। আজ থেকে ১২৫ বছর আগে ১৮৯৩ সালের ৯-ই সেপ্টেম্বর আমেরিকা মহাদেশের শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বমহাধর্মসম্মেলনে প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক ধর্ম ও বেদান্ত দর্শনের প্রতিনিধি স্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন তা সমগ্র পাশ্চাত্য জগতের সামনে পরাধীন ভারতকে গৌরবান্বিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শক্তির পীড়নে নিষ্পেষিত, হতদরিদ্র ভারতবর্ষেরও যে বিশ্বজগৎকে দেবার মতো অতুলনীয় সম্পদ আছে তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছিল। সেদিন পশ্চিমি দুনিয়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক দর্শনের পদতলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছিল। আর এই অভূতপূর্ব ঘটনার যিনি কান্ডারি, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। যাঁকে আমরা বাংলাদেশের মানুষ তখনও সেভাবে চিনতে পারিনি; চিনেছিল ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মানুষ। ভারতীয় ধর্ম দর্শনের যোগ্যতম প্রতিনিধি হিসাবে — তাঁকে এই জায়গায় পৌঁছে দিতে তাদের অবদান আজ অনস্বীকার্য। এই বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করে স্বামীজির 'শিকাগো বক্তৃতার' ১২৫তম বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমরা তাঁর 'শিকাগো বক্তৃতামালার' তাৎপর্যকে ফিরে দেখার চেষ্টা করব।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার শিমুলিয়া পল্লিতে ১৮৬৩ সালের ১২-ই জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত অ্যাটর্নি শ্রী বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। তিনি ছিলেন তাঁদের পঞ্চম সন্তান। তাঁর পিতা মার্জিত রুচিসম্পন্ন, অজ্ঞেয়বাদী মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে বাইবেল এবং প্রখ্যাত কবি হাফিজের কবিতার অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মাতা ছিলেন হিন্দুধর্মের চিরাচরিত

ঐতিহ্যে নিমগ্না মহানুভব মহিলা। ফলে স্বামীজির ভবিষ্যৎ চিন্তাধারার ওপর তাঁর পিতা-মাতার প্রভাব ছিল অতুলনীয়।

স্বামীজির বাল্যজীবনের ঘটনাবলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং অভিনব। তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশন থেকে তাঁর বিদ্যালয় পর্বের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৭৯ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর তিনি তৎকালীন হিন্দু কলেজে (বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ) উচ্চশিক্ষার জন্য ভরতি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই কলেজে পড়া তাঁর হয়নি। তিনি পরের বছর জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশন (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ) থেকে তাঁর পরবর্তী শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শুধুমাত্র বিদ্যাশিক্ষাতেই নয়, বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর মনে দুটি ভাবের বিকাশ ঘটেছিল — প্রথমত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও ইংরেজি ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার ফলে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ অথবা প্রায়োগিক পরীক্ষা ব্যতীত তিনি কোনো কিছুকেই বিশ্বাস বা স্বীকার করতেন না। অন্যদিকে সনাতন হিন্দুধর্ম ও তৎবর্ণিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর মনে প্রবল জিজ্ঞাসা ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য বা জ্ঞান লাভের প্রেরণাই তাঁকে ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কতগুলি ধরা বাঁধা মতবাদ ও প্রণালীবদ্ধ উপাসনায় তৃপ্ত না হয়ে তিনি অন্যত্র পথের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। ১৮৮০ সালে কলকাতায় শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আজীবন যুক্তির পূজারি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পাঠানুরাগী নরেন্দ্রনাথ বহু পরীক্ষা ও যুক্তিতর্কের দ্বারা অবশেষে এই পৌত্তলিক গৃহী সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিনেল। এঁর কাছেই সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হবার পর ভারতবর্ষকে জানার জন্য, ভারতের প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য, সনাতন হিন্দু ধর্মকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তিনি প্রব্রজ্যা ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। পরিব্রাজকরূপে আসমুদ্রহিমাচলকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি। কখনও স্থান পেয়েছিলেন রাজার গৃহে, কখনও ভিখারির কুটিরে, কখনও খোলা আকাশের নীচে। স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি সংকটকে। প্রত্যক্ষ করেছিলেন তৎকালীন ভারতের অজস্র নরনারীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল। পিতার কাছে ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষালাভ করেছিলেন — 'কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করিও না'। এই উপদেশই বোধহয় তাঁকে স্বদেশে-বিদেশে রাজার প্রাসাদে, ভিখারির পর্ণকুটিরে সমভাবে বিচরণ করতে সমর্থ করে তুলেছিল। কিন্তু যেখানেই গিয়েছিলেন তাঁর জ্ঞান, পান্ডিত্য, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, জনমোহিনী ব্যক্তিত্ব মানব হৃদয়ের বিশিষ্ট আসনে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর সংস্পর্শে আসা ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ তাঁকে নতমস্তকে মেনে নিয়েছিল। পরাধীন ভারতবাসী তাঁর উপদেশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল জীবনের আদর্শ। কিন্তু পরাধীন ভারতের দৈন্যতা, দারিদ্র্য তাঁকে দিত অসহনীয় পীড়া। বহু বিনিদ্র রজনিতে ধ্যানে, ভাবনায়, মননে তিনি খুঁজতেন ভারতের প্রকৃত মুক্তির পথ। এই বাস্তব জীবনদর্শনই তাঁকে করে তুলেছিল ভারতের আধ্যাত্মিক গুরু। ভারতীয় দর্শনের মূল প্রবক্তা, যাঁর মধ্যে ছিল না কোনো সংশয়, ছিল না দ্বিধা।

১৮৮৬ সালের ১৬-ই আগস্ট তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি কলকাতার বরানগরের একটি ভাঙা বাড়িতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাহায্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ'-এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৮৭ সাল থেকে তিনি মঠ ছেড়ে কখনও একাকী কখনও গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পরিব্রাজক হিসেবে বেরিয়ে পড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতের জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করা। পরিব্রাজক হিসাবে তিনি সামান্য কৌপীনমাত্র সম্বল করে পায়ে হেঁটে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। সন্ন্যাসী হিসাবে হিমালয় ছিল তাঁর প্রিয় স্থান। কিন্তু সেখানেই তিনি থেমে থাকেননি। পরিভ্রমণকালে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন, রাজা-ভিখারি, ব্রাহ্মণ-চন্ডাল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এই তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভা, তেজোদ্দীপ্ত আকর্ষণীয় কান্তি, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, আধ্যাত্মিক প্রভাব এবং যুক্তিবাদী মনোভাবে সকলেই হয়েছিলেন মুগ্ধ। যাঁরা এসেছিলেন ক্ষুরধার যুক্তির তরবারির আঘাতে তাঁর ধারণাকে বিধ্বস্ত করতে তাঁরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অনুরাগী। এইভাবে তিনিও প্রায় সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের সাথে পরিচিত হতে হতে ভারতবর্ষের সমাজের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। ক্রমশ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে, ভারতের মানুষ দারিদ্র্যক্লিষ্ট হলেও সৎ, এঁদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, অন্ন সংস্থানের জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি ও জ্ঞান আনয়ন করতে হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছ থেকে। এই সমস্ত কাজের জন্য দরকার বিপুল অর্থ যা ভারতের মানুষের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব। তাই তাঁকে আবেদন নিয়ে যেতে হবে পাশ্চাত্যে। মহীশুরের দেওয়ান স্যার শেষাদ্রী আয়ারকে লেখা স্বামীজির একটি পত্র এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। সেখানে তিনি লিখেছিলেন —

> ''আমি প্রধানত: এদেশে আমার স্বদেশের কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। .... দেওয়ানজী সাহেব, ইহার জন্য সঙ্ঘ ও অর্থ দুইই আবশ্যক — প্রথমদিকে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু অর্থ চাই। কিন্তু ভারতে আমাদের কে টাকা দিবে? ..... এই কারণেই আমি আমেরিকা আসিয়াছি। আপনার মনে আছে, আমি দরিদ্রের নিকট ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, ধনীদের টাকা লই নাই, কেননা তাঁহারা আমার ভাব ও আদর্শ বুঝে না।''

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি মহীশূরের মহারাজা চামরাজেন্দ্র ওয়াদিয়ারের কাছেই সর্বপ্রথম তাঁর পাশ্চাত্য গমনোদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর ভারত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে দেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছিলেন —

> ''আমাদের বর্তমান প্রয়োজন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা; কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র ক্রন্দন ও ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। উহারা যেমন বর্তমান উন্নত

বৈজ্ঞানিক প্রনালীতে কৃষি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা দিবে, বিনিময়ে আমাদেরও উহাদিগকে কিছু দিতে হইবে। ভারতবর্ষে বর্তমানে দিবার মতো এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ব্যতীত আর কি আছে? সেইজন্য সময় সময় আমার ইচ্ছা হয় যে, বেদান্তের অত্যুদার ধর্ম প্রচার করিতে পাশ্চাত্য দেশে গমন করিব।"

ভাবলেও অবাক হতে হয়, একটি পরাধীন দেশের তরুণ সন্ন্যাসীর পাশ্চাত্যের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান আদান-প্রদানের অভিনব ভাবনা ও সাহস কত বিপুল ছিল, আর ছিল স্বদেশের জন্য মঙ্গলকামনা।

মহারাজা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি যখন মাদ্রাজে পৌঁছান তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য ও অনুরাগীগণ তাঁর অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পেয়ে অতি কষ্টে পাঁচশো টাকা তাঁর যাত্রার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি পাশ্চাত্য যাত্রা সম্পর্কে মনস্থির করে উঠতে পারেননি। তাই এই টাকাও নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে তিনি হায়দ্রাবাদের 'মেহবুব কলেজে' প্রদত্ত 'আমার পাশ্চাত্যদেশ গমনোদ্দেশ্যে' নামক বক্তৃতায় বেদ-বেদান্তের অতুলনীয় মহিমা জগতের সামনে প্রকাশ করার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এইসময় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিকাগো শহরে মহামেলার অঙ্গ হিসাবে একটি বিরাট ধর্মমহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে উপযুক্ত প্রতিনিধিগণ সভায় যোগদান করতে পারবেন এরকম ঘোষণাও করা হয়েছিল। ফলে তাঁর মাদ্রাজি অনুরাগী আলসিঙ্গা পেরুমল, মহামতি আনন্দ চার্লু, জাস্টিস সুব্রাহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে পাঠাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করেন, এক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ ছিল রাজা-মহারাজাদের কাছে নয়, জনসাধারণের কাছে ভিক্ষা করেই যেন এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন দক্ষিণভারতীয় ভক্তগণ। এদিক থেকে বিবেচনা করে দেখতে গেলে বলা যায় যে, আমরা বাংলাদেশের মানুষ স্বামীজিকে নিয়ে যতই মাতামাতি করি না কেন, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠার পেছনে মাদ্রাজবাসীর যে অবদান, তার কাছে আমরা সর্বদা ঋণী হয়ে থাকব।

অবশ্য স্বামীজির ইচ্ছা সর্বদা ফলবতী হয়নি। তাঁর যাত্রাপথকে সুগম করার জন্য অনন্তর মহারাজা, খেতড়ির মহারাজা ও তাঁর দেওয়ান মুনশি জগমোহন লাল প্রভূত অর্থ, জাহাজের প্রথম শ্রেণির একটি কেবিনের টিকিট, তাঁর বিশ্ববিখ্যাত লাল ও গেরুয়া রেশমবস্ত্র ও পাগড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও এইসব বহুমূল্য বসন, অর্থ কীভাবে তত্ত্বাবধান করবেন তা নিয়ে স্বামীজি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য খেতড়ির মহারাজার একান্ত অনুরোধেই স্বামীজি তাঁর 'বিবেকানন্দ' নামটি তাঁর পরিচয় হিসাবে শেষ পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। কারণ বিদেশ যাত্রার পূর্বে তিনি 'বিবিদিষানন্দ', 'সচ্চিদানন্দ' প্রভৃতি নামেও পরিচিত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তদের নিকট অবশ্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ একজন সুদর্শন সন্ন্যাসী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন। অবশেষে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বিদেশিদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করে

এর সর্বজনীন উদার ভাবসমূহ আধুনিক মনের উপযোগী বৈজ্ঞানিক যুক্তিমন্ডিত করে প্রচার করতে তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১-শে মে বোম্বাই বন্দরের 'পি এন্ড ও' কোম্পানির 'পেনিনসুলার' জাহাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

বিশ্বইতিহাস দেখলে দেখা যায় জগতের কোনো মহৎ কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হয়নি। পরাজয়, ব্যর্থতার সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়েই মানবচরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব ফুটে ওঠে। স্বামীজির বিদেশ যাত্রাও সহজ হয়নি। বহু পরিশ্রম, তিতিক্ষা ও ত্যাগের মধ্যে দিয়ে তিনি জগতের সামনে নিজের উদ্দেশ্যে পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বোম্বাই বন্দর ছাড়ার সময় তাঁকে বিদায় জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় আলসিঙ্গা পেরুমল ও মুনশি জগমোহন লাল। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজ সিংহল ছুঁয়ে মালয় উপদ্বীপ, চীন প্রভৃতি স্পর্শ করে জাপানে এসে পৌঁছায়। উপরোক্ত দেশগুলি দেখে স্বামীজি যত-না তৃপ্ত হয়েছিলেন, তার থেকে বেশি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন জাপানে এসে। জাপানের অধিবাসীদের সম্পর্কে তিনি একটি চিঠিতে (১০-ই জুলাই, ১৮৯৩) বলেছিলেন — 'তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। .... আমাদের দেশের যুবকরা প্রতিবৎসর দলে দলে চীন ও জাপান যাক্।' জাপানিদের ক্ষিপ্র উন্নতি, সাহস ও উদ্যম তাঁকে চমৎকৃত করেছিল। জাপানের ইয়কোহামা থেকে প্রশান্তমহাসাগর পার হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাঙ্কুবার বন্দর শহরে তাঁর জাহাজ পৌঁছায়। এখান থেকে রেলপথে কানাডার মধ্যে দিয়ে তিনি শিকাগো শহরে পৌঁছেছিলেন। এখানেই শুরু হয় তাঁর প্রকৃত ধৈর্য ও সাহসের পরীক্ষা। সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে প্রথমেই তিনি বালকের মতো বিস্ময়বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। উপরন্তু তাঁর গৈরিক বর্ণের অদ্ভুত পোশাকের জন্য নানা শ্রেণির মানুষ এবং বালকেরা তাঁকে উত্যক্ত করতে শুরু করেছিল। অনভিজ্ঞ হবার জন্য এখানকার শহরগুলোতে কুলি, ড্রাইভার, হোটেল মালিক সবাই তাঁর থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে শুরু করেছিল। যাই হোক, এত কিছুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তিনি শিকাগোর একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তিনি ১২ দিন ছিলেন। পরদিনই তিনি বিশ্বপ্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন। এখানকার বিচিত্র পণ্যসম্ভার, শিল্পকলার নিদর্শন তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর পোশাক, চেহারা বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু তা শুধু কৌতূহলের জন্য। এখানে থাকাকালীন এক প্রচন্ড সংবাদ তাঁকে অস্তিত্বের সঙ্কটের সামনে এনে উপস্থিত করেছিল। তিনি জানতে পেরেছিলেন ধর্মমহাসভা সেপ্টেম্বর মাসের আগে শুরু হবে না। আর যারা এই মহাসভার নিয়ম অনুযায়ী পরিচয়পত্র নিয়ে আসেননি তাঁরা এই সভায় প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে পারবেন না। আর এই মহাসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ তারিখ পার হয়ে গেছে। ফলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জুন — সেপ্টেম্বর অবধি এই দেশে থাকতে গেলে তাঁর অর্থ অবশ্যম্ভাবীভাবে শেষ হয়ে যাবে। তাই যে আশায় তিনি এসেছিলেন তাও পূর্ণ হবে না। এইভাবে তিনি বিষম সমস্যায় পড়লেও সহজে হাল ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি শুনেছিলেন বোস্টন শহরে শিকাগো অপেক্ষা শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বেশি ও খরচও অনেক কম। তাই তিনি বোস্টনের দিকে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বোস্টন যাবার পথে ট্রেনে তাঁর আলাপ হয়েছিল বোস্টন সন্নিকটস্থ ব্রিজি মেডোজ গ্রামের জনৈক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার সঙ্গে। তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখানে থাকার কথা স্বামীজি তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন —

> ''এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, প্রত্যহ আমার যে এক পাউন্ড খরচ হইতেছিল তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন।''

যাই হোক, এখানেই তিনি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। সকলের অনুরোধে শীতের উপযুক্ত পোশাকও বানিয়েছিলেন। গেরুয়া পোশাক রেখেছিলেন কাজের জন্য। এতেও তাঁর সঞ্চিত অর্থ অনেকখানি খরচ হয়ে যায় যা তাঁর অতিরিক্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। এই গ্রামেই তাঁর আলাপ হয়েছিল হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার সুপন্ডিত অধ্যাপক জে এইচ রাইটের সঙ্গে। তিনিই তাঁকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির সভাপতি মি. বনি অধ্যাপকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। ফলে তিনি স্বামীজিকে একটি চিঠি, রেলওয়ে টিকিট ও ধর্মমহাসভার ঠিকানা লিখে স্বামীজিকে মহাসভায় যোগদানে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন।

পুনরায় শিকাগোতে পৌঁছে তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি ধর্মমহাসভার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছিলেন। কেউ তাঁকে সেই ঠিকানার সন্ধান দিতে পারল না। সবাই তাঁকে নিগ্রো বলে অগ্রাহ্য করতে লাগল। প্রচন্ড শীতের মধ্যে হোটেল খুঁজে না পেয়ে তিনি রেলওয়ে মালগুদামের সামনে পড়ে থাকা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাইরে তুষারপাত, অন্ধকার, অনাহার — সব মিলিয়ে তিনি মৃত্যুসম অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। পরদিন পুনরায় নতুন উদ্যমে তিনি মহাসভার ঠিকানা খুঁজে পাবার চেষ্টায় পথে পথে ঘুরতে থাকেন। প্রচন্ড ক্ষুধার তাড়নায় এবং অর্থের অভাবে তিনি দ্বারে দ্বারে খাবারের জন্য ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই দেশে ভিক্ষা দেবার রীতি নেই, সবাই তাঁকে অপমান করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। অবশেষে ক্লান্তিতে, পথশ্রমে, অনিদ্রা, অনাহারে, সহায়-সম্বলহীনভাবে পথের ধারে বসে পড়েছিলেন। নিজের কোনো ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আর তিনি স্থির করতে পারছিলেন না। এমন সময় অলৌকিকভাবে তাঁর সম্মুখস্থ বিশাল প্রাসাদের দরজা খুলে একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কি ধর্মমহাসভার একজন প্রতিনিধি? এই ভদ্রমহিলাই মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেইল। স্বামীজির দুরবস্থা ও বিড়ম্বনার কথা শুনে তিনি তাঁকে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে ধর্মমহাসভার দপ্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে অধ্যাপক রাইটের দেওয়া নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে তিনি মহাসভার প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মহাসভার প্রতিনিধিবর্গের জন্য নির্দিষ্ট গৃহে অতিথিরূপে স্থান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর আলাপ হয়েছিল ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, জৈনধর্মের প্রতিনিধি বীরচাঁদ

গান্ধী, থিয়সফিস্ট সোসাইটির প্রতিনিধি মিসেস এনি বেসান্ত ও আর চক্রবর্তীর সঙ্গে। এইভাবেই বিদেশে তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটেছিল। তাঁর জীবনের এই প্রবাস অধ্যায়ে আমেরিকান মহিলা সমাজের অবদানের কথা তিনি তাঁর জীবদ্দশায় বার বার উল্লেখ করেছিলেন। আমাদের দেশের মেয়েদেরও এমন স্বাধীনচেতা করে গড়ে তোলা তাঁর স্বপ্ন ছিল। শিকাগো ধর্মসভায় প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার ফলে তাঁর যে উদ্দেশ্যে বিদেশে আসা তার অনেকখানি পূর্ণ হয়েছিল।

বিশ্বধর্মমহাসভা বিষয়টি কী এবং স্বামীজি এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এখানে যোগদানের জন্য কেন এত আগ্রহী হয়েছিলেন সে বিষয়ে পর্যালোচনা করলে মনে হয় স্বামীজির মনে দুটি বিষয় কাজ করেছিল। প্রথমত স্বদেশের দুঃখ, দারিদ্র্য, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীকরণের উপায় অনুসন্ধান, যা তিনি স্বদেশের মহিমাকে বজায় রেখেই পাশ্চাত্যের গুণাবলীর অনুসরণে করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ভারতের অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ বেদ-বেদান্তের জ্ঞান সারাবিশ্বে প্রচার করে ভারত সম্পর্কে সকল জাতির মনে শ্রদ্ধাবোধের সঞ্চার করা। যে শ্রদ্ধা অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারিদের অপপ্রচারের ফলে এবং ভারতীয়দের অজ্ঞ আচরণের ফলে। এই বিশ্বধর্মসম্মেলনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্যপূরণের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মার্কিন সরকার ‘কলম্বিয়ান এক্সপোজিসন’ নামক একটি বিরাট মেলার আয়োজন করেছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ‘বিশ্বধর্মমহাসভা’ যেখানে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিবর্গ একই মঞ্চ থেকে নিজ নিজ ধর্মমত ব্যাখ্যা করার সুযোগ লাভ করবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধরনের বিশ্বধর্মসম্মেলন ছিল একটি অভিনব ঘটনা। এই ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তা ছিলেন জন হেনরী ব্যারোজ মহাশয়। যে সকল ধর্মের প্রতিনিধিরা ধর্মমহাসভায় যোগদান করেছিলেন সেই ধর্মগুলি হল — খ্রিস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, ইহুদিধর্ম, তাওধর্ম, পারসিকধর্ম, গ্রীকচার্চ ও প্রোটেস্ট্যান্টধর্ম, কনফুসীয়ধর্ম ও শিন্টোধর্ম। এই মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শিকাগো শহরের আর্ট ইন্সটিটিউটের ‘কলম্বাস হলে’। এই মহাসভার অধিবেশনের দুটি ভাগ ছিল — মূল শাখা ও বিজ্ঞান শাখা। মূল শাখার অধিবেশন হয়েছিল ‘কলম্বাস হলে’ আর বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনগুলি হয়েছিল ‘ওয়াশিংটন হলে’। মহাসভার উদ্যোক্তারা এই সভার কতগুলি মহতী উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন —

বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিদের একই মঞ্চে আহ্বান করা — যা হবে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কী কী সাধারণ সত্য রয়েছে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা।

বিভিন্ন ধর্মগুলি কীভাবে পরস্পরকে আলোকিত করছে অথবা করতে পারে সেই সংক্রান্ত আলোচনা।

শিক্ষা, দারিদ্র্য প্রভৃতি বিশ্বের বিভিন্ন ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে কিনা তা বিচার করা।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতিগুলিকে অধিকতর সৌহার্দ্যসূত্রে বাঁধা যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হয়।

ধর্মমহাসভার এই মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধ মতও ছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রধান মনে করতেন যে, খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মকে একই সভায় সম আসনে বসানোর অর্থ হল — সব ধর্মকে খ্রিস্টধর্মের মতো পবিত্র ও আলোকিত ধর্মের সমান সম্মান দেওয়া যা মেনে নেওয়া অসম্ভব। ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তা ড. ব্যারোজ এই ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন ছিলেন। ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের এই আত্মম্ভরিতা স্বামীজির দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন 'বিশ্বধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে।'

১৮৯৩ সালের ১১-ই সেপ্টেম্বর 'কলম্বাস হলে' এই ধর্মমহাসভার উদ্বোধন হয়। ২৭-শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সভার অধিবেশন চলেছিল। সম্মেলনে উপস্থিত ১০টি ধর্মের উদ্দেশ্যে ১০ বার সুগম্ভীর ঘন্টাধ্বনির দ্বারা অধিবেশনের সূচনা হয়। হলের মধ্যে বিশাল মঞ্চ। মঞ্চের মাঝে রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মনায়ক কার্ডিনাল গিবন্স সুউচ্চ সিংহাসনে আসীন। তাঁর বামপার্শ্বে প্রাচ্যদেশীয় প্রতিনিধিগণ ও দক্ষিণপার্শ্বে পাশ্চাত্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত; সব মিলিয়ে প্রায় ছয়-সাত হাজার মহাপন্ডিত ব্যক্তি। সেই বিরাট হল, সভার গাম্ভীর্য, জাঁকজমক আর সামনে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রোতাকে দেখে স্বামীজির মতো মানুষও ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সবচেয়ে বড়ো কথা তিনি কোনো লিখিত বক্তৃতা তৈরি করে নিয়ে যাননি। শিষ্য আলসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন — 'আমি এতদূর ঘাবড়ে গেলাম যে সকালবেলার অধিবেশনে বলতে সাহস পেলাম না।' ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে যদিও তাঁর স্থান ত্রিশ জনের পরে নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু তিনি বলবার সাহস পেলেন না। দ্বিতীয় অধিবেশনে চারজনের বক্তৃতার পরও যখন তিনি বলতে পারলেন না তখন সভাপতি মহাশয় তাঁকে আর সময় দিতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। তখন তিনি বাধ্য হয়ে বক্তৃতার স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। এরপরের ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে। প্রচন্ড শঙ্কিত চিত্তে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে ধর্মমহাসভার কনিষ্ঠতম প্রতিনিধি এই ত্রিশবর্ষীয় যুবক সন্ন্যাসীর শ্রোতৃমন্ডলীর প্রতি প্রথম সম্বোধন ছিল 'সিস্টারস্ অ্যান্ড ব্রাদারস্ অফ আমেরিকা'। যেখানে অন্যান্য সকলেই প্রচলিত প্রথা অনুসারে শ্রোতৃমন্ডলীকে 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টল্‌মেন' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর এই নতুন সম্বোধন যেন বক্তার সঙ্গে শ্রোতার হৃদয়নিহিত প্রেমভাবের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছিল। ফলে দুমিনিট ধরে সভাগৃহে শুধু করতালিধ্বনি ও উচ্ছ্বাস শোনা গিয়েছিল।

স্বামীজির প্রথম দিনের প্রথম বক্তৃতাটি ছিল সংক্ষিপ্ত। যেখানে তিনি ভারতবর্ষের মানুষের সনাতন বিশ্বাসকেই তুলে ধরেছিলেন —

> ''আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি, যে ধর্ম জগতকে শিখিয়েছে
> সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীনতার আদর্শ। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই

আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি .... বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা সকলেই যেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে দেয় তেমনি .... হে ঈশ্বর, সরল জটিল নানা পথ ধরে যারা চলেছে, তাদের সকলের একমাত্র লক্ষ্যস্থল তুমিই। .... সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও তার ফলশ্রুতি ধর্মোন্মত্ততা বহুদিন ধরে এই সুন্দর পৃথিবীকে গ্রাস করে রেখেছে .... কিন্তু আমি আশা করি এই সম্মেলনের সম্মানে আজ সকালে যে ঘন্টাধ্বনি হল, তা যেন সমস্ত ধর্মোন্মত্ততা, সমস্ত অত্যাচারের মৃত্যুঘন্টা হয়।"

তাঁর এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে শুধু বাগ্মিতা বা আন্তরিকতা নয়; ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁর মতো স্পষ্টভাবে আর কেউ প্রকাশ করতে পারেননি। ফলে তাঁর প্রথম বক্তৃতাই তাঁকে শিকাগো শহরে সুপরিচিত করে তুলেছিল। রাস্তায় রাস্তায় শোভা পেয়েছিল এই তরুণ সন্ন্যাসীর তেজোদ্দীপ্ত ছবি। সেখানকার বিখ্যাত পত্রিকা 'দি হেরাল্ড' লিখেছিল, 'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দই অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

প্রথম দিনের বক্তৃতার পর তিনি 'আমাদিগের মধ্যে মতভেদ কেন?' নামক একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ছাড়া ১৯-শে সেপ্টেম্বরের আগে কোনো বক্তৃতা দেননি। ধর্মমহাসভায় ১৭দিন ধরে প্রায় এক হাজারের ওপর প্রবন্ধপাঠ হয়েছিল। প্রতিটি প্রবন্ধের জন্য আধঘন্টা করে সময় বরাদ্দ ছিল। প্রতিদিন বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রবন্ধপাঠ চলত। মাঝে আধঘন্টার ভোজনবিরতি ছিল। এর মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই স্বামীজিকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। অন্যান্য বক্তৃতা শুনতে শুনতে শ্রোতারা যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ি যাবার উপক্রম করতেন তখন সভাধিপতি ঘোষণা করতেন সবশেষে স্বামীজি বক্তব্য রাখবেন। ফলে সকলেই পুনরায় ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা শুরু করতেন বলে 'বস্টন ইভনিং ট্রান্সস্ক্রিপ্ট' নামক সুবিখ্যাত পত্রিকা মন্তব্য করেছিল। এই মহাসভায় হিন্দুধর্মের আরও প্রতিনিধি থাকলেও নিজ গুণে স্বামীজিই হয়ে উঠেছিলেন মধ্যমণি। উপরোক্ত সংবাদপত্রটি আরও লিখেছিল — 'তিনি শুধু মঞ্চের একদিক থেকে অপরদিকে হেঁটে গেলেই হাততালি পেয়ে থাকেন।' জনৈক ইহুদি বুদ্ধিজীবী নিউইয়র্ক 'বেদান্ত সোসাইটি'তে বলেছিলেন যে স্বামীজির বক্তব্য শুনেই তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন তাঁর ইহুদিধর্ম সত্য। তাঁর মনে হয়েছিল স্বামীজি শুধু একটি ধর্মের নয়, বরং পৃথিবীর সব ধর্মের প্রতিভূ হয়ে কথা বলেছিলেন। যথার্থই ধর্মমহাসভার মর্মবাণী তাঁর বক্তব্যর মধ্যে দিয়েই সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯-শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক যে লিখিত বক্তৃতাটি তিনি পাঠ করেছিলেন তা ছিল ধর্মমহাসভায় তাঁর প্রধান বক্তৃতা। কারণ এই সভায় তাঁর নাম নথিভুক্ত হয়েছিল হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু তাঁর বক্তব্য হিন্দুধর্ম দিয়ে শুরু হলেও শেষ হয়েছিল বিশ্বজনীন ধর্মের মধ্যে দিয়ে। সহজ-সরল ভাষায় বেদান্তের সত্যকেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি চারটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন; একটি হল মনুষ্যমাত্রেই স্বরূপত পরমাত্মার অংশ অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রেই আত্মা। শ্রোতাদের তিনি 'অমৃতের পুত্র' বলে সম্বোধন করেছিলেন

যা তাঁদের অভিনব বলে মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ধর্ম মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয় নয়, সম্পূর্ণ অনুভূতিসাপেক্ষ একটি বিষয়। তাঁর এই প্রবন্ধে তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও বহু দেবদেবী সংক্রান্ত যে অলীক মত খ্রিস্টান মিশনারিগণ কর্তৃক পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত ছিল তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — 'হিন্দুদের ধারণায় প্রতিটি ধর্মই এমন এক প্রক্রিয়া যা জাগতিক মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করে। তাই এই ধর্মের দৃষ্টিতে সব ধর্মই সমান সত্য।' এইভাবে তিনি বিশ্বজগৎকে দেখিয়েছিলেন একটি ধর্মে অবিচল থেকেও মানুষ নিজেকে কীভাবে বিশ্বধর্মের আঙিনায় প্রসারিত করতে পারে।

২০-শে সেপ্টেম্বর তিনি 'ধর্মই ভারতের প্রকৃত অভাব নহে' শীর্ষক যে প্রবন্ধ আলোচনা করেছিলেন সেখানে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি বলেছিলেন যে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর করার কোনো প্রকল্প যদি পশ্চিমিজগৎ করতে পারে সেই সাহায্য লাভের আশায় তিনি এখানে এসেছিলেন। শুধুমাত্র মিশনারি পাঠিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দিলেই ভারতীয়দের উপকার হবে না তা তিনি তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমিক রূপটি সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল। ওদেশের মানুষের ব্যক্তিগত বিলাস-বৈভবের প্রাচুর্য দেখে স্বদেশের নিরন্ন মানুষের জন্য স্বামীজির প্রাণ বারংবার কেঁদে উঠত। দেশের মানুষের মোটা ভাত ও কাপড়ের চিন্তা তাঁকে অস্থির করে তুলত। ২২ তারিখে মহাসভার বিজ্ঞান শাখার সামনে তিনি দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন পূর্বাহ্নে — 'নৈষ্ঠিক হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত দর্শন' এবং অপরাহ্নে 'ভারতের আধুনিক ধর্মসমূহ'। ২৩ তারিখেও একই বিষয় পর্যলোচনা করেছিলেন। ২৫ তারিখ অপরাহ্নে 'হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি বিজ্ঞান শাখার অধিবেশনগুলিতে আরও চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ২৬ তারিখে তিনি 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের ক্রমপরিণতি' শীর্ষক বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রতিদিনের বক্তৃতাই আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্বে পরিপূর্ণ থাকত। সেখানে থাকত না কোনো ধর্মের প্রতি শাণিত আক্রমণ বা নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা; বরং স্নেহমধুর কণ্ঠে সকল বিবাদ মীমাংসার দ্বারা মানবজাতিকে দৃঢ় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। ২৭ তারিখে অর্থাৎ মহাসভার শেষ দিনে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা ছিল তাঁর বাগ্মিতার চরমক্ষণ। তিনি বলেছিলেন —

> ''ধর্মজগতে অগ্রসর হবার জন্য বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান, খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা হিন্দুকে মুসলিম হতে হইবে না। প্রত্যেককে নিজের বিশেষত্ব ত্যাগ না করিয়া অপরের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও ক্রমশ: উন্নত হইতে হইবে।''

তিনি আরও বলেছিলেন —

> ''ধর্মমহাসভা যদি জগৎকে কিছু দেখাইয়া থাকে তা হল এই — পবিত্রতা, উদারতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদগুণসমূহ কোনো ধর্মেরই নিজস্ব নহে। প্রত্যেক ধর্মেই উন্নত

> চরিত্রের নর-নারীর জন্ম হইয়াছে। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করিয়া থাকেন যে, সকল ধর্ম উচ্ছন্ন হইবে শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্বান্ত:করণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি এবং এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে— 'সমর নহে — সহায়তা, বিনাশ নহে — বরণ, দ্বন্দ্ব নহে — মিলন ও শান্তি'।"

স্বামীজি বিশ্বধর্মমহাসভায় কোনো মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেননি বা নিজ মত জোর করে অন্যকে গ্রহণ করাবারও উদ্যোগ নেননি। বরং অলৌকিক তত্ত্ব-দর্শনের সাহায্যে ধর্মজগতের সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিষয়গুলি সকলের গোচরে এনেছিলেন। তাঁর ইংরেজি চরিতাখ্যায়কগণ লিখেছিলেন — 'শিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় স্বামীজী যে মহাসত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যে অদ্ভুত আশার বানী শুনাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টের পর আর কোনো ব্যক্তির নিকট ওদেশের লোক তেমন কথা শুনে নাই।' এইভাবেই স্বামীজি একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী থেকে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সেইসময় শিকাগোর পথে পথে তাঁর ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল, প্রখ্যাত সংবাদপত্রগুলিতে তাঁর প্রশংসা প্রকাশিত হয়েছিল। 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' উল্লেখ করেছিল — 'ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেশ বুঝিতেছি, ভারতবাসীর নিকট খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করা কতদূর নির্বুদ্ধিতা।' 'দি বস্টন ইভনিং ট্রান্সস্ক্রিপ্টের' মতে, 'তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহের মহত্ত্বের জন্য এবং চেহারার গুণে তিনি ধর্মসভায় একজন বিশেষ প্রিয় পাত্র।......... অথচ সহস্র সহস্র ব্যক্তির নিকট হইতে এই বিশেষ সমাদর ইনি ঠিক বালকের ন্যায় সরলভাবে গ্রহণ করেন।' 'দি প্রেস অফ আমেরিকা' লিখেছিল —

> "ভারতের অতীত বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন প্রিয়দর্শন ও তরুণ আচার্য্য বিবেকানন্দ মহাসভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র সভ্যমন্ডলী স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁর বাগ্মিতা, মুখনি:সৃত অপূর্ব বুদ্ধিজ্যোতি এবং তাঁহার চিরসম্মানিত ধর্মের সৌন্দর্য বর্ণনকল্পে তিনি যে সুন্দর ইংরাজী বলেন সমস্ত একত্রিত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দের মনে এক গভীর ভাব সঞ্চার করিয়াছে।"

'দি ইন্টিরিয়ার শিকাগো' লিখেছিল — 'ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁর প্রশংসাধ্বনিতে মহাসভার সর্বাপেক্ষা অধিক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের আগ্রহাতিশয়ে যাঁহাকে পুন: পুন: সভামধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।' 'দি নিউইয়র্ক ক্রিটিক'-এর মতে — 'বক্তৃতাশক্তি তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা .... কথাগুলি শুনিলেই বোঝা যায় অন্ত:স্থল ভেদ করিয়া উঠিতেছে।' মহাসভার বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি মারউইন স্নেল বলেছিলেন, 'নি:সন্দেহে তিনিই ছিলেন মহাসভার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।' মহাসভার জেনারেল সভাপতি রেভারেন্ড ব্যারোজ-এর মতে, 'স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শ্রোতৃবর্গের উপর আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।'

তাঁর বাণী সেদেশের সাধারণ মানুষকেও উদ্দীপিত করেছিল। ১৮৯৩ সালের ১২ অক্টোবর প্রকাশিত একটি পত্রিকায় 'ধর্মমহাসভায় আন্ট হানা' শীর্ষক কবিতায় অজ্ঞাত কবি লিখেছিলেন —

''তারপর আমি শুনলাম সেই হিন্দু সন্ন্যাসীর বক্তৃতা,
পরণে যাঁর কমলা পোশাক,
যিনি বললেন সমস্ত মানুষ ভগবানের অংশ —
কম নয় এতটুকু
আর বললেন: আমরা পাপী নই, পাপী নই মোটে।
কাজেই আবার স্বস্তি পেলাম আমি,
আর ধর্মমহাসভা কম্পিত হল সমর্থনের গর্জনে।।"

কিন্তু এতসব সাফল্য সত্ত্বেও তিনি নিজের জন্য কোনো কৃতিত্ব দাবি করতেন না। ধর্মমহাসভার পরে একটি চিঠিতে তিনি অধ্যাপক রাইটকে লিখেছিলেন — 'অমি যদি সফল হয়ে থাকি; তিনিই আমাকে তাঁর শক্তি যুগিয়েছেন।' আর আমেরিকানদের প্রতি তাঁর মনে যে শ্রদ্ধাবোধের জন্ম হয়েছিল তা জানা যায় তাঁর একটি পত্র থেকে — 'আমেরিকানদের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে কোনো অভাব নেই।............ এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না।' আবার অন্যদিকে সংবাদপত্রে তাঁর খ্যাতির বিবরণী পাঠ করে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন — 'আজ হইতে আমি নির্জনচারী সন্ন্যাসীর স্বাধীনতা হারাইলাম।' সমসাময়িক বহু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এমনকি ভারতীয়রাও তাঁর সম্পর্কে কুৎসা রটনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের সংকল্পে অবিচল ছিলেন। ধর্মমহাসভার পরেও আরও তিনবছর তিনি আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর বিশ্বধর্ম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্বপক্ষে বহু বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু এত আদর, সম্মান, যশোগাথা, প্রশংসা তাঁর চিত্তে বিন্দুমাত্র অহংকারের ছায়া ফেলতে পারেনি। পাশ্চাত্যে বিশেষত আমেরিকান মহিলাদের স্বাধীন মনোভাব, জগতের প্রতিটি বিষয়ে তাঁদের আধিপত্য ও অধিকার দেখে তিনি যেমন চমৎকৃত হয়েছিলেন তেমনি তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের সমসাময়িক মহিলাকুলের দুরবস্থার চিত্র তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি ১৮৯৩ সালে হরিপদ মিত্রকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন —

''এদেশের স্ত্রীদের মতো স্ত্রী কোথাও দেখি নাই।..... আমাদের পোড়া দেশে মেয়েদের পথ চলবার যো নেই। .... আমরা কি করছি? আমরা স্ত্রী লোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি — তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।"

শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজির সাফল্যের কথা যখন ভারতে এসে পৌঁছেছিল গোটা দেশ আনন্দে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। একজন ভারতবাসী যে পাশ্চাত্যবাসীর কাছে এত মর্যাদা পেতে পারে তা তাদের কাছে কল্পনার

অতীত ছিল। ফলে তাঁরা নিজেদের সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিল। ভারতেরও এমন কিছু আছে যা জগতের কাছে মর্যাদা পেতে পারে! ফলে দেশে ফিরে তিনি পেয়েছিলেন বীরের সম্মান আর তাঁকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল জাগরণের সূচনা। বস্তুতপক্ষে শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজির আত্মপ্রকাশ ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনিই স্পষ্টতই দেশবাসীকে ও জগৎবাসীকে দেখাতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষ যদি পৃথিবী জয় করে তবে তা করবে ভাবাদর্শের দ্বারা; প্রেম, মৈত্রী ও উদারতার দ্বারা — শিকাগো বক্তৃতায় তারই সূচনা ঘোষিত হয়েছিল।

''নিজ জীবনে কোন আদর্শ রূপায়িত করিতে না পারিলে শুধু কথা বলিয়া অপরকে সে আদর্শ অনুযায়ী জীবনগঠন করিতে অনুপ্রাণিত করা কঠিন হয়। কেহ যদি উচ্চ আদর্শগুলি নিজ জীবনে রূপায়িত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ভাবধারা স্বাভাবিকভাবেই অপরের হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া যায়, তাহার কথায় অপরের হৃদয় স্পর্শ করিবার মতো যথেষ্ট শক্তি আসে।''

— স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

আইনের দাসত্ব ও মুক্তির পথ

ড. সুদীপ্ত ঘোষ
অধ্যাপক
রসায়ন বিভাগ

আইন কখনোই মুক্তি আনে না বরং তার মধ্য দিয়ে মুক্তির চিন্তা আমাদেরকে তার দাসে পরিণত করে। তোমরা হয়তো অবাক হচ্ছ যেখানে আমরা আইন দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আইন প্রণয়নের প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছি এবং যারা দ্বারা মুক্তি তথা মানুষ ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা, শান্তি ও আনন্দ ফিরিয়ে আনতে চাইছি, সেখানে আমার এই কথা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও বেমানান বলে মনে হবে। তাহলে এরকম কথা আমি কেন বললাম তার ব্যাখ্যায় পরে আসছি।

প্রথমে আমি আমাদের অর্থাৎ মানুষের বিষয়ে কথা বলি যার জন্য সমাজ, দেশ ও আইন। আমি বিশ্বাস করি মানুষের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে মানুষ করেছে অন্য সকল প্রাণী থেকে। প্রথমটা তার নিজের অনন্য ও একমাত্র সত্তা ও দ্বিতীয়টা তার মুক্ত চিন্তা। অন্য প্রাণীদের তা আছে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু এইটুকু জানা আছে যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য মানুষকে মানুষ করেছে এবং আলাদা করেছে অন্য সকল প্রাণী থেকে। এখন প্রথম বৈশিষ্ট্য যা অনন্য সত্তা তা আমরা একটু খেয়াল করলেই অনুধাবন করতে পারি। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আলাদা একে অপরের থেকে যা তার অনন্য পরিচয় বহন করে মানুষের মহাসাগরে। প্রত্যেকের বুদ্ধি, চিন্তা, আবেগ, দর্শন ও কর্মক্ষমতা আলাদা যা আমাদের সমাজ ও দেশকে করেছে এক বৈচিত্র্যের সমাবেশ এবং নিশ্চিত করে তা আমরা আনন্দচিত্তে উপভোগ করছি। যেমন শুধু রবীন্দ্রনাথ থাকলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য বোঝা যেত না; যদি না নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বঙ্কিমচন্দ্র না থাকতেন। এই বৈচিত্র্যময়তা, প্রকৃতি তথা জীবনের অনন্য ও সত্য উপাদান যা প্রকৃতি ও মানবজীবনকে পূর্ণ করে তার মানে খুঁজে দেয়। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে তা আমরা উপভোগ করি সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে যা সম্ভব হয়েছে একে অপরের এই অনন্য সত্তার জন্য। আর আমি বিশ্বাস করি সম্পর্ক ছাড়া আমি, তুমি, আমরা, আমাদের সমাজ, দেশ এমনকি পৃথিবী এবং মহাবিশ্ব অর্থহীন। এখন এই নিজস্ব অনন্য সত্তার বীজ লুকিয়ে আছে আমাদের দ্বিতীয় সত্তার মধ্যে যা হল মুক্ত চিন্তা। মুক্ত চিন্তা যা আমাদের অনন্য সত্তার পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখে ও বয়ে নিয়ে যায় এক কথায় আমি জীবিত শুধু শারীরিকভাবে নয় বরং আমার আমি হিসাবে। এই মুক্তচিন্তা যা আমাদের নতুন নতুন অজানা পথের সন্ধান দেয়, বয়ে নিয়ে আসে নতুন সৃষ্টি। যুগে যুগে এই মুক্তচিন্তার ওপর ভর করে মানুষ তার অনন্য সমাজ, জাতি ও দেশ গড়ে তুলেছে। মানবসভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে বিভিন্ন দিক থেকে যেমন বিজ্ঞান, সাহিত্য, প্রযুক্তি ও দর্শন এবং আরও অনেক কিছু, যার স্বাদ ও গন্ধে আমরা মোহিত, আশ্চর্য ও পরিপূর্ণতা অনুভব করি। সঠিক করে বলতে গেলে মুক্তচিন্তা সৃষ্টির ধারক ও বাহক। তোমরা হয়তো বলবে এই মুক্তচিন্তাই হিটলার, নাতসিদের জন্ম দিয়েছে যা মানুষের মুক্তচিন্তা সহ তার জীবনকে কেড়ে নিয়েছে। হ্যাঁ এটাও সত্য যে তার দায়ভার, আমাদের ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞানের অভাব মুক্তচিন্তার নয়।

কিন্তু যারা মুক্তচিন্তার অস্তিত্ব ও কার্যকারিতা বুঝতে পারছে না তারা নিশ্চয় এটা বুঝতে পারছে যে মুক্তচিন্তা না থাকলে আমার মানুষ হতাম না, বরং নেহাত এক যন্ত্রে পরিণত হতাম যার রিমোট কন্ট্রোল যার হাতেই থাকুক না কেন আমরা খুশি হতাম না। এখন আমার মূল বক্তব্যে আসি। তা হল মানবসভ্যতার শুরু থেকেই আমরা আইনের খোঁজ করেছি। কারণ আমরা দেখেছি আমাদের ভালোমন্দ বোঝার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আমরা খারাপ কাজটাই বেশি করে চলেছি। কারণ হিসাবে আমি বিশ্বাস করি আমাদের অন্তরে গড়ে দেওয়া অনন্য সত্তা ও মুক্তচিন্তার মানদন্ডের ছবিটা আমরা ভুলে গিয়েছি বা তা থেকে নিজেরা বিচ্যুত হয়েছি। কোথাও আমাদের মধ্যে গড়ে দেওয়া সম্পর্ক ভেঙে গেছে এবং আলো থেকে অন্ধকারে প্রবেশ করেছি। অন্ধকার দাসত্বেরই আর এক নাম। অন্ধকারে হেঁটে কেউ কোনো দিন সঠিক পথ খুঁজে পায় না; না কেউ কাউকে তা খুঁজে দিতে পারে। এখন আইন করে আমরা এই খারাপ কাজটিকে চিহ্নিত ও তার যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু মজার বিষয় হল, আমরা আমাদের দুর্বলতায় গড়া মানদণ্ডকে আমাদের মুক্তিদন্ড হিসেবে ধরে নিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি আইন শুধু আমাদের খারাপ কাজ দেখাবে ও শাস্তি দেবে তা নয়, বরং সেটা থেকে বিরত রাখবে এবং তা থেকে মুক্তি দেবে। কিন্তু বাস্তব চিত্র আমাদের ধারণার বিপরীত ছবি দেখাচ্ছে, যেখানে দিন দিন খারাপ কাজ আরও বাড়ছে। আর আমরা আমাদের ভুলভাবে ধরে নেওয়া বিশ্বাসকে প্রশ্ন না করে আরও বেশি বেশি করে আরও কঠোর আইনের জন্য যারপরনাই চিৎকার আন্দোলন করছি। ভাবছি আর একটু কঠোর আইন এলে হয়তো আমাদের এই চিত্রপট পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন সমাজ গড়বে যেখানে আর কোনো খারাপ কাজ থাকবে না।

কিন্তু আমাদের স্বপ্ন ও বিশ্বাস ঘুমভাঙার প্রতি সকালে ভাঙছে টিভির পর্দায় ও খবরের কাগজে। আমরা আরও যেন কোনো এক অজানা দাসত্বে আমাদের সঁপে দিচ্ছি। সমাজ, দেশ কোথাও নরকে পরিণত হচ্ছে। কোথাও তো ভুল হচ্ছে; আর ভুল পথে হাঁটছি। আমি বিশ্বাস করি ভুল আমাদের চিন্তা ও চেতনায় এবং তা থেকে জন্ম নেওয়া বিশ্বাসে। ভুল আমাদের মুক্তির পথ। আমি বিশ্বাস করি আইন নয় বরং আমাদের অনন্য সত্তা ও মুক্তচিন্তাই আমাদের মুক্তির পথের আলো। আইন কখনোই মানুষের অন্তর পরিবর্তন করতে পারে না এবং যার কোনো প্রমাণ ইতিহাসে কিংবা বর্তমানে আমরা দেখিনি। আইন প্রকৃত অর্থে আমাদের দুর্বলতায় গড়া দন্ড মাত্র। আইন হল শুধুমাত্র আয়না যা আমাদের গায়ে লেগে থাকা নোংরাটা দেখায়, কখনোই তা পরিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু এখন যতই আমরা আইনের দিকে তাকাব ততই তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব এবং ভুলে যাব যে আমাদের অনন্য সত্তা ও মুক্তচিন্তাই আমাদের মুক্তির পথ। আমরা নিজেদের দিকে না তাকিয়ে আমাদের বানানো আইনের দিকে তাকিয়ে মানুষ, সমাজ ও দেশের মুক্তির প্রার্থনা করছি। কোথাও যেন এক পরাধীন মানুষের অন্ধকারে আর্তনাদ স্বাধীনতার জন্য তার শাসকের কাছে। কিন্তু সেই পরাধীন মানুষ ভুলে গেছে মুক্তি শাসক নয় বরং তাকেই ছিনিয়ে নিতে হবে তার নিজস্ব সত্তা ও মুক্ত চিন্তায়। তাই আর একবার ফিরে দেখবার সময় এসেছে, নিজেদের ভুলগুলি চিনে নেবার সময় এসেছে। আমাদের ভেঙে দেওয়া সম্পর্কের ছবিটা আবার জুড়ে নিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকের মধ্যে সেটি বিদ্যমান। আর কোনো না কোনো সময় তা আর্তনাদ করে এবং আমরা তার কান্না শুনতে পাই। আমাদের সব ভুল স্বীকার করে ফিরে যেতে হবে সেই সম্পর্কের আলোয়। যে আলো আমাদের পথ দেখাবে নিজ অন্তরের; আর নিয়ে যাবে মুক্তির পথে মুক্ত করতে আইনের দাসত্ব থেকে।

বিজ্ঞানভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

রাজদীপ দত্ত
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমত্ব দেশ-বিদেশে স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু এসবের বাইরেও কর্মী রবীন্দ্রনাথের এক অন্যতর ও বৃহত্তর পরিচয় আছে, যে পরিচয় তাঁর কবিপরিচয়ের তুলনায় কোনো অংশে ন্যূন নয়। পল্লীসংস্কার, গ্রামসংগঠন, শিক্ষাসংস্কার, সমবায় প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি বহুমুখী বিচিত্র কর্মজালে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। যে প্রেরণা ও আদর্শ থেকে তিনি পল্লীসংস্কার করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে নতুন শিক্ষাদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন, সেই প্রেরণা এবং আদর্শ থেকেই তিনি দেশের মানুষকে বিজ্ঞানচর্চা ও যুক্তিবোধে প্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনের মধ্যে দিয়ে যে নতুন ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি, তার একদিকে আছে ঔপনিষদিক মণীষায় স্নাত চিরন্তন ভারতবর্ষের মূল্যবোধ এবং অপরদিকে আছে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনীকৌশল। বিজ্ঞানের নামে অন্ধ যান্ত্রিকতাকে তিনি কখনোই প্রশয় দেননি কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে বৃহত্তর মানবপ্রগতি ও মানবমুক্তির চিত্তদূতরূপে দেখা দিয়েছে, সেখানে তিনি তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

নবজাগরণ, বিজ্ঞানবোধ ও রবীন্দ্রনাথ

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল, নানা কারণেই তার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল সে যুগের সবচেয়ে আলোকপ্রাপ্ত পরিবার — ঠাকুরবাড়ি। পিতামহ দ্বারকানাথ, পিতা দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ সহ রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ও অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দ সকলেই কমবেশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন। ঠাকুরবাড়ির বাইরেও আলোকপ্রাপ্ত মনীষীদের দ্বারা বাংলার বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটেছিল সেদিন। রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায় ছিলেন এবিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী। ১৮২৩ সালে তৎকালীন গভর্নর লর্ড আমহার্স্টকে লেখা একটি চিঠিতে রামমোহন খুব স্পষ্টভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিতে পুরোদস্তুর শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতি সমেত একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। রামমোহনের জীবিতকালেই হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে কৃতী ছাত্রদের যে গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠে তারা 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে দিয়ে একটি সমিতি গঠন করে রীতিমতো বিজ্ঞানচর্চা করতেন। 'পরিপাকক্রিয়ার শারীরবৃত্তঘটিত বিবরণ' থেকে শুরু করে 'বাঁকুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানগত চেহারা' ইত্যাদি শারীরবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের সযত্নলিখিত প্রবন্ধ সেখানে পাঠ করা হত। প্রসঙ্গত ডিরোজিওর শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে রাধানাথ শিকদার পরবর্তীকালে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাজে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন।

ত্রিকোণমিতি ও টপোগ্রাফির সাহায্য নিয়ে এই রাধানাথই মাউন্ট এভারেস্টের প্রকৃত উচ্চতা পরিমাপ করে একে পৃথিবীর উচ্চতম চূড়া বলে প্রমাণ করেন। বাঙালির কাছে এই আবিষ্কারও কম আনন্দের বিষয় নয়। যাই হোক ইয়ং বেঙ্গলের সমসাময়িককালে বাংলার বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞানচর্চায় নানাভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' — এর পাতায় লেখেন 'বিজ্ঞানরহস্য', যে বই আজও আমাদের পড়তে ভালো লাগে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় বিজ্ঞানবিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ লেখা মুদ্রিত হয়েছিল, যার প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন — এমন প্রমাণ মেলে। এপ্রসঙ্গে আর একজনের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, তিনি হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর সম্পাদিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এবং তাঁর সুবিখ্যাত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' বইটির দ্বারা তিনি বিজ্ঞানকে সর্বজনীনভাবে সকলের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন ও পেরেছিলেন। এই বইটি সেকালের ছাত্রদের বিজ্ঞান শিক্ষার টেক্সটবুক হিসেবে ব্যবহার করা হত। রবীন্দ্রনাথও বাল্যকালে টেক্সটবুক হিসেবে এই বই পড়েছিলেন।

এবার আসি ঠাকুরবাড়ির কথায়। বিজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী। মূলত তাঁর আগ্রহের বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে সযত্নে জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'তিনি প্রকটরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম'। এই প্রকটরের পুরো নাম রিচার্ড এ প্রকটর। তখনকার কালে তাঁর একাধিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই জনপ্রিয় হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ির বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র, রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মহর্ষির তৃতীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ-এর নাম করতেই হয়। হেমেন্দ্রনাথ একটি আদ্যন্ত বিজ্ঞানবিষয়ক বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম'। এই তথ্যটি আজ অনেকেরই অজানা। বইটিও দুষ্প্রাপ্য। হেমেন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বইটি প্রকাশিত হয়নি। হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটিতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন দুটি বিষয়েরই আলোচনা আছে। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ছিল, তার মধ্যে গণিতবিদ্যা মূলত জ্যামিতির চর্চা ছিল প্রধান। তিনিই সর্বপ্রথম আনিউক্লিডিয় জ্যামিতির চর্চা করার বিষয়টি ভাবেন। বিষয়টি বুঝতে হলে সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এখন আমরা স্কুলে-কলেজে যে জ্যামিতির চর্চা করি, তা 'ইউক্লিডিয় জ্যামিতি' নামে পরিচিত। ইউক্লিডিয় জ্যামিতিতে আয়তন পরিমাপের তিনটি একক — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ। এইভাবে জগতের আয়তন মেপে আমরা বলি আমাদের জগৎ ত্রিমাত্রিক। কিন্তু দেখা গেছে সবক্ষেত্রেই বস্তুজগৎ ইউক্লিডের জ্যামিতি মেনে চলে না। যেমন ইউক্লিড যেভাবে সরলরেখার সংজ্ঞা দিয়েছেন তার নিয়ম সর্বত্র সমান নয়, তা নির্ভর করে স্পেস-এর গড়নের ওপর। এইভাবে ইউক্লিডের নিয়মের বাইরে এক অন্যধরনের জ্যামিতিচর্চার কথা ভেবেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ। এই বিষয় নিয়ে তাঁর আলোচনামূলক লেখাগুলি হল — ১) জ্যামিতির নূতন সংস্করণ (ভারতীতে প্রকাশিত), ২) স্থান-মান (ভারতী তে প্রকাশিত), এছাড়াও 'Geometry in which the 12th axiom has been replaced by other ones' — এই শিরোনামে তাঁর একটি ইংরেজি পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকাতেই 'বিজ্ঞানশিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এর থেকেই মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ কোন্ পরিবেশে, কোন্ আবহাওয়ায় ও কাদের সাহচর্যে বেড়ে উঠেছিলেন। ফলে ছোটোবেলা থেকেই তাঁর মধ্যেও যে এক প্রবল বিজ্ঞানবোধ গড়ে উঠবে, এ আর আশ্চর্য কী!

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা ঃ

মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ একটি অস্বাক্ষরিত প্রবন্ধ লেখেন — 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। সুতরাং তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনাই হল একটি বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা। এই রচনার প্রেরণা অত ছোটো বয়সে তাঁর মনের মধ্যে কেমন করে এল, উত্তরকালে তিনি তা জানিয়েছেন —

> "বয়স তখন হয়তো বারো হবে, পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলোয়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় ও অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।" (বিশ্বপরিচয়, ভূমিকা অংশ)

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ খুব উৎসাহের সঙ্গেই বিজ্ঞান পড়েছিলেন। শৈশবের শিক্ষাপ্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন — গণিত, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং সাহিত্যের পাঠ দিতে একাধিক গৃহশিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন তাঁর জন্য। কবির যখন নয় কি দশ বছর বয়স, তখন সীতানাথ দত্ত মহাশয় আসতেন ফি রবিবারে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে —

> "এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। জ্বাল দিবার সময় তাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নিচে নামিতে থাকে এবং এইজন্যই জল টগবগ করে, ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন, সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে..... যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।" [জীবনস্মৃতি/নানা বিদ্যার আয়োজন]

এছাড়াও মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রের কাছে শৈশবেই তিনি অস্থিবিদ্যা ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানা বিবরণ শব-ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিখেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে তাদের বাড়ির তিনতলার একটি ঘরে নরকঙ্কাল রাখা ছিল বালকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছের 'কঙ্কাল' নামক গল্পটির মধ্যে

শৈশবের সেই অভিজ্ঞতা রসমূর্তি ধারণ করে। শৈশবে প্রাণিবিদ্যায় আগ্রহের কারণে তিনি যে আমের আঁটি আর আতার বিচি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন, সেই ইচ্ছেই পরিণত বয়সে শ্রীনিকেতনে কৃষি সম্পর্কে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রকাশিত। উত্তরকালে শ্রীনিকেতনে কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কিত যে গবেষণার সূত্রপাত তিনি করেন তারই অঙ্গ হিসেবে তিনি তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিজব্যয়ে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠান। তাঁর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় পুত্র রথীন্দ্রনাথ কৃষিবিজ্ঞান পড়ে পরবর্তীকালে নিজেও কৃষিবিজ্ঞানী হয়েছিলেন।

এইভাবে সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও সিসৃক্ষা বজায় ছিল। জীবনের উপান্তে এসে ছিয়াত্তর বছর বয়সে তিনি রচনা করলেন আদ্যন্ত একটি বিজ্ঞানবিষয়ক বই, নাম 'বিশ্বপরিচয়'। বইটি উৎসর্গ করলেন সেকালের সবচেয়ে খ্যাতশীর্ষ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। সহজবোধ্য বিজ্ঞানবিষয়ক বই রচনার পরিকল্পনা বহুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মাথায় ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন — 'সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের ছাঁচ গড়ে দেবার ইচ্ছা আমার মনে ছিল'। সেই ইচ্ছারই সাকার রূপ 'বিশ্বপরিচয়'। গোটা বইটি সমকালীন বিজ্ঞানবিষয়ক পাঁচটি প্রবন্ধের সমাহার। প্রবন্ধগুলি হল — (১) পরমাণুলোক (২) নক্ষত্রলোক (৩) সৌরজগৎ (৪) গ্রহলোক ও ভূলোক ও (৫) উপসংহার। আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বকে সাহিত্যরসে সিক্ত করে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় পরিবেশন করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছু নাও করতেন, তবুও এই একটি বই-এর জন্য বাংলার বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে তিনি খ্যাতকীর্তি হয়ে থাকবেন।

কবি ও বিজ্ঞানী ঃ জগদীশচন্দ্র ও আইনস্টাইন

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল সুগভীর। জগদীশচন্দ্র ছিলেন বিজ্ঞানী অথচ সাহিত্যপ্রেমী; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্যিক অথচ বিজ্ঞানপ্রেমী। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই পারস্পরিক যুগলপ্রেম তাঁদের বন্ধুত্বকে গভীর ও সুদূরপ্রসারী করেছিল। জড়বস্তুর মধ্যে সজীবতার লক্ষণ নিয়ে জগদীশচন্দ্রের যুগান্তকারী গবেষণা সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করতে রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন — 'জড় কি সজীব'। এই প্রবন্ধ পাঠ করে জগদীশচন্দ্র রীতিমতো বিস্মিত হয়ে কবিকে বলেছিলেন : 'তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিতে'। বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্রকে নতুন গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে অর্থভিক্ষা করে জগদীশচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের একটি তারিখবিহীন চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন —

> "আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহারাজের অতিথি হইয়া কয়েকদিন আছি... তিনি শীঘ্র বোধহয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বৎসরের মধ্যেই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধকরি তুমি বর্তমান সংকট হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে।" (চিঠিপত্র, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ:৪০)

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০-শে নভেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে জগদীশচন্দ্রের স্বপ্নের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ‘বসু বিজ্ঞান মন্দির’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথ যারপরনাই আনন্দিত হন। জগদীশচন্দ্রকে লেখেন ‘এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল, আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এ তো তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প; তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল’। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন সংগীতও রবীন্দ্রনাথের রচনা — ‘মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন করো মহোজ্জ্বল আজ হে’। আজও এই প্রতিষ্ঠানের প্রস্তরফলকে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীস্বরূপ এই গানটি মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে জগদীশচন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; পরমবন্ধুর মতো তাঁর কাজে প্রেরণা, অর্থ ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন; রবীন্দ্রনাথের প্রতিও জগদীশচন্দ্রের ছিল তেমনই গভীর ভালোবাসা। ১৯১৩ সালের ১৩-ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার তিনদিন বাদে জগদীশচন্দ্র তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন, ছোটো চিঠি। পুরোটাই তুলে দিচ্ছি —

> ‘বন্ধু,
>
> পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জয়মাল্যভূষিত না দেখিয়া বেদনা অনুভব করিয়াছি। আজ সেই দুঃখ দূর হইল। দেবতার এই করুণার জন্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব? চিরকাল শক্তিশালী হও, চিরকাল জয়যুক্ত হও। ধর্ম তোমার চিরসহায় হউন।
>
> তোমার
> জগদীশ’

(জগদীশচন্দ্র বসু পত্রাবলী, পৃষ্ঠা-১৯২)

এই পারস্পরিক সৌহার্দ্যই কবি ও বৈজ্ঞানিকের সম্পর্ককে ঐতিহাসিক করে রেখেছে।

অপর একজন বিশ্ববন্দিত বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ১৯২৬ সালে জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু প্রকৃত সংযোগ গড়ে উঠে ১৯৩০ সালে। সে বছর অন্তত চারবার তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে এই চারটি সাক্ষাতের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল প্রথম সাক্ষাৎটি। যেটি সংগঠিত হয় ১৯৩০ সালের ১৪-ই জুলাই বার্লিনের বাইরে কাপুথ নামক ছোটো শহরে আইনস্টাইনের বাড়িতে। এই সাক্ষাৎকারের লিখিত বিবরণ আছে। তাঁদের মধ্যে মূলত আলোচনা হয়েছিল ‘অস্তিত্বের দর্শন’ বিষয়ে। পুরো সাক্ষাৎকারটি আলোচনা করার পরিসর এখানে নেই, তবে সেই ঐতিহাসিক আলোচনার মর্মার্থ রবীন্দ্রনাথের মতে, কোনো বস্তুর বা ব্যক্তির অস্তিত্ব মানবচেতনা নিরপেক্ষ হতে পারে না। মানুষের চেতনার রঙেই চুনিপান্না রঙিন হয়ে ওঠে; আকাশ ধরা দেয় নীল রঙে সেজে। মানুষের চেতনায় যা ধরা দেয় না, মানুষের কাছে তা সত্য নয়। কিন্তু আইনস্টাইন এবিষয়ে কবির সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে সত্যের ধারণা স্বাধীন ও স্বরাট। মানুষের চেতনার বাইরেও সত্যের অস্তিত্ব আছে বা থাকা সম্ভব। তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল প্রীতিপূর্ণ। ১৯২৬ সালে প্রথম

সাক্ষাতের পর কবির সম্পর্কে বিজ্ঞানীর মনে যে যথেষ্ট শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। প্রথম সাক্ষাতের পর জার্মান ভাষায় লিখিত একটি চিঠিতে আইনস্টাইন কবিকে জানাচ্ছেন, 'জার্মানিতে যদি এমন কিছু থাকে, যা আমি আপনার জন্য করতে পারি, তবে যখন খুশি দয়া করে আমাকে আদেশ করবেন'। এতটাই সুসম্পর্ক ছিল তাঁদের যে আইনস্টাইনের পালিতা কন্যা মার্গট কবির খুবই অনুরাগিনী ছিলেন। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়াভ্রমণের সময় এই মার্গট স্বামী দিমিত্রি মারিয়ানফের সঙ্গে কবির সফরসঙ্গী হন। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছরের জন্মবার্ষিকীতে যে 'Golden Book of Tagore' প্রকাশিত হয়, তাতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অপরাপর মনীষীদের পাশাপাশি আইনস্টাইনও কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যে বিজ্ঞানের সক্রিয় পদক্ষেপ

আগেই বলেছি মাত্র সাড়ে বারো বছর বয়সে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম প্রবন্ধটাই সরাসরি বিজ্ঞানবিষয়ক, নাম 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি'। পিতার মুখে শোনা জ্যোতির্বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি শিশুমনের আকর্ষণ ও কৌতূহলই এই প্রবন্ধের জন্ম দিয়েছে। সতেরো বছর বয়সে লেখা 'কবিকাহিনী'তেও দেখি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বালক কবির বিস্ময় ছন্দে প্রথিত —

“সে কি ভয়ানক কান্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্যচন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মন্ডলে মন্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে পড়ে হেথায় হোথায়।”

এরপর প্রাক্ যৌবনে 'সোনার তরী' কাব্যের নানা কবিতায় (মূলত 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায়) ও ছিন্নপত্রের নানা চিঠিতে উঠে এসেছে সমকালীন প্রাণ অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ তখন প্রাণিবিজ্ঞানের জগতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এইসময় ডারউইন পড়েছিলেন। তাঁর 'On the Origin of Species' বইটি রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। কবির কল্পনা ও ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ মিলেমিশে আছে ছিন্নপত্রের এই পত্রাংশে —

> “এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন... আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলাম।”

বসুন্ধরা কবিতায় শুনি এরই রসভাষ্য —

“মনে হয়, যেন মনে পড়ে

যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তত্ত্ব অবিশ্রাম কলতান, অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে......”

আধুনিক বিজ্ঞান বলে বর্তমান মানবলোক কোনো এক মৃত তারার সন্তান। আমাদের দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মৌল উপাদান একসময় তারার কেন্দ্রস্থলের বিপুল তাপ ও চাপের অধীন ছিল। আমাদের রক্তকণিকার মধ্যেকার লৌহ এসেছে সেখান থেকেই। আধুনিক বিজ্ঞানের এই ভাষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে কেমন করে জানি অনুভব করেছিলেন। 'পত্রপুট' কাব্যে দেখি তার প্রকাশ —

'বলি — হে সবিতা
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণু-পরমাণু'

বিজ্ঞানের অন্তরিস্থিত 'আদিতম বিস্ময়' কবিকে অভিভূত করেছিল। সেই চেতনাই ধ্বনিত হয়েছে — 'আকাশ ভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ ... বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান' — এই গানটিতে। কবি চিরবিস্মিত পথিকের মতোই 'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে' আত্মসমর্পণ করেছেন। পরিণত বয়সে তিনি উপনিষদের সূত্রকে আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান ও কাব্যের মিলিত প্রজ্ঞা তাঁকে সৃষ্টিরহস্যের মূলগত 'এক'-এর উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছিল — 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক'। কবির এই কথা তাঁর অনুভূতিলোক থেকেই উত্থিত।

বিজ্ঞান যেখানে মানব প্রগতিকে বিকশিত করে, বিজ্ঞান যেখানে বৃহত্তর কল্যাণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ সেখানে বারবার বিজ্ঞানের কাছে শ্রদ্ধাবনত হয়েছেন। কিন্তু এই বিজ্ঞান যখন বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থে বৃহত্তর কল্যাণকে ক্ষুণ্ণ করে, সেখানেই মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী হয়েছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'মুক্তধারা' নাটক। সেখানে যন্ত্র নয়, যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধেই তাঁর প্রতিবাদ। 'রক্ত-করবী' নাটকেরও মূলভাব এটাই; তবে তা আরও বেশি শিল্পিত ও বহুস্তরীয়।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবিষয়ক নানা ভাবনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এখানে ছুঁয়ে গেলাম। বলা বাহুল্য প্রতিটি বিষয় আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে, তবে স্বল্প পরিসর এই প্রবন্ধের অন্তে পৌঁছে এটুকু বুঝলাম যে তিনি নিজে বিজ্ঞানী না হলেও যথার্থ আধুনিকতা ও যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে তাঁর মধ্যে শিশুকাল থেকেই একটি যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক মন তৈরি হয়ে উঠেছিল, যা তিনি আজীবন বহন করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রজয়ন্তীসভার অভিনন্দনবার্তায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —

“কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।”

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সামনে দাঁড়িয়ে এই বিস্ময়োক্তিই তাঁর প্রতি আমাদের অন্তিম মূল্যায়ন।

বাংলার স্থাপত্যকীর্তি ঃ মন্দির

শুভজিৎ দে
কলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ
ইতিহাস সাম্মানিক

প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে সৌধ নির্মাণের প্রথা অব্যাহত রয়েছে। নগরায়ণের অনিবার্য অঙ্গ হিসাবে উপাসনার ক্ষেত্রেও স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠেছে। প্রাচীন কালে নির্মিত অনেক সৌধ প্রাকৃতিক কারণে কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের আঘাতে বর্তমানে নিশ্চিহ্ন প্রায়। যদিও বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের আচরণে বৈপরীত্যের নজির অতীতেও যেমন ছিল, বর্তমানেও আছে। যেমন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের বিষ্ণুমন্দির নির্মাণে অকুণ্ঠ সহয়তা; হিন্দু ও মুসলিম শাসক কর্তৃক মঠ-মন্দির, দরগা নির্মাণে সহায়তাদান ইত্যাদি।

বাংলার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে সোনালি ফসলের ক্ষেত্র অথবা উঁচুনীচু অনুর্বর প্রান্তর ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বনভূমি। প্রবাহমান নদী-নালার জলধারায় সঞ্জীবিত ভূভাগের স্থানে স্থানে আজও চোখে পড়ে নানান ধর্মীয় ইমারত। কালের প্রভাবে অযত্ন ও কংক্রীটের জঙ্গলে কর্মব্যস্ত মানুষ ডুব দেওয়ায় সেসব স্থাপত্যসৌধের অধিকাংশ জীর্ণ হয়ে পড়লেও যেগুলি টিকে আছে, তার থেকেও অনুমান করা যায় প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যা ও শৈল্পিকবোধের পরিচয়। পরবর্তীকালে মূলত খ্রিস্টীয় পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলায় নবপর্যায়ে মন্দির নির্মাণের সূত্রপাত হয় এবং সেই ধারাবাহিকতা বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত বজায় থাকে। মূলত শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলনের প্রভাবেই যে এই পুনরুজ্জীবনের প্রধান কারণ সেকথা মন্দিরগবেষকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন। এই নবপর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের গঠনরীতির রূপরেখা অনেকটাই নির্ভর করে মন্দিরের ওপরের অংশের আচ্ছাদন সংক্রান্ত নির্মাণকৌশলের ওপর। আর সেই কারণেই এই আচ্ছাদনরীতির বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই মন্দিরের প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। আচ্ছাদনসহ গঠনরীতি অনুসারে নবপর্যায়ে নির্মিত এই মন্দিরগুলিকে প্রধানত পাঁচটি স্থাপত্যরীতিতে ভাগ করা যায়, যথা - চালা, রত্ন, শিখর বা রেখ, পীঢ়া বা দেউল ও দালানস্থাপত্যরীতি। এছাড়াও বাংলার মন্দিরস্থাপত্যে মিশ্ররীতির প্রভাবও দেখা যায়। শিখররীতি ও পীঢ়ারীতি বাংলায় প্রাচীনকালে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে নবপর্যায়ে শিখররীতির মন্দির নির্মাণে যথেষ্ট রূপভেদ দেখা যায়। চালা, রত্ন ও দালান — এই তিনরীতির উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ণ আঞ্চলিক প্রতিভার ভিত্তিতে যা বাংলার কোনো অখ্যাত স্থপতির সৃষ্ট কারিগরি প্রযুক্তির এক অপূর্ব নিদর্শন।

বাংলার মন্দিররীতি

- চালা
  - একচালা
  - দোচালা
  - জোড়বাংলা
  - চারচালা
  - আটচালা
  - বারোচালা
- রত্ন
  - একরত্ন
  - পঞ্চরত্ন
  - নবরত্ন
  - ত্রয়োদশরত্ন
  - সপ্তদশরত্ন
  - একবিংশরত্ন
  - পঞ্চবিংশরত্ন
- শিখর
  - নগরদেউল
  - পীঢ়াদেউল
  - বঙ্গীয় শিখরশৈলি
- দালান
  - একতলা
  - দোতলা
- পীঢ়া
- মিশ্র

বাংলার স্থাপত্যকীর্তি ঃ চালাস্থাপত্যরীতি ঃ

বাংলায় মন্দিরস্থাপত্যের ক্ষেত্রে নিজেস্ব স্থাপত্যরীতি হল ‘চালা স্থাপত্যরীতি’। এই চালা আবার বিভক্ত ছিল ছয় ভাগে। ফলে এই চালারীতি ছিল যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ। যারজন্য বাংলার মন্দির স্থাপত্যকীর্তি বিশেষ উৎকর্ষের দাবি রাখতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন পরবর্তীকালে আমরা যে সুলতানী ও মুঘলস্থাপত্যের চাকচিক্য ও রমরমা দেখি সেখানেও সগর্বে বিরাজ করেছেন বাংলার সমসাময়িক মন্দিরস্থাপত্যরীতির স্থপতিগণ। নিম্নে বাংলার এই ‘চালা স্থাপত্য’ নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার মন্দিরস্থাপত্যরীতির একটি বিশিষ্ট দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

একচালা বা তিনচালা

গ্রামবাংলায় বাঁশ ও খড় দিয়ে সহজে ও সংক্ষিপ্তভাবে তৈরি হয় একচালা যা একটি ত্রিভুজের আকৃতিতে উঁচু দেওয়াল থেকে নেমে আসে। স্থানীয় ক্ষেত্রে একে বা এই ধরনের চালাকে বলা হয়ে থাকে ‘পরচালা’। সাধারণত মাটির চারচালা বা আটচালা ঘরের সামনের দাওয়া বা বারান্দাটিকে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই একচালা বা পরচালার প্রয়োজন হয়।

বহুক্ষেত্রে বাঙালি ঘরামি মিস্তিরিদের হাতে পড়ে এই একচালাটির দুপাশের ফাঁকা অংশ ঢাকা দেবার প্রয়োজনে বাড়তি চালা সংযোগ করায় সেটি হয়ে দাঁড়ায় তিনচালা। মন্দির রূপকল্পনায় এই রীতি যে অনুসরণ করেননি বাঙালি স্থাপতিরা এমন নয়, বেশকিছু শিখর বা আটচালামন্দিরের সামনের দিকে প্রয়োজনে অকিঞ্চিৎকর মুখমন্ডল হিসাবে এই রীতির ব্যবহার হয়েছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সেটি একচালার মতো দেখতে হলেও স্থাপত্যগত কারণে সেটি তিনচালার রূপ নেয়। এজাতীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায় মেদিনীপুর জেলার নোয়াদার রাধাগোবিন্দমন্দিরের (১৮৬০ খ্রিঃ) ক্ষেত্রে।

দোচালা বা একবাংলা ঃ

পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে খড়ে ছাওয়া দোচালারীতির সাধারণ কুটির অজস্র দেখা যায়। তবে দোচালারীতির যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায় সেকেলে দুর্গাপূজার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের খড়ে ছাওয়া চন্ডীমন্ডপস্থাপত্যের মধ্যে। তখনকার মিস্তিরিদের তৈরি করা এই খড়ে ছাওয়া বাঁকানো চালের দোচালাচণ্ডীমন্ডপকে বলা হত 'পাটাকুমারী'। সেদিক থেকে দোচালাকুঁড়েঘরের এই আদলকে বা শিল্পশৈলীকে মন্দিরস্থপতিরা অনুসরণ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপ দিয়েছিলেন দোচালামন্দির নির্মাণে। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি আলোচনাচক্রে বক্তৃতা রাখার সময় বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ সত্যকাম সেন তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, মানুষ যেভাবে তাঁর জীবনযাপন করেন, তিনি তাঁর ভগবানকেও সেইভাবেই দেখতে চান। এই বক্তব্যেরই প্রতিফলন এই চালাশিল্পরীতিতে প্রকাশ পেয়েছে।

অন্যদিকে ঐ শৈলীর মন্দিরকে 'একবাংলা' নামকরণও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলার এই কুঁড়েঘর শুধু যে মন্দিরস্থপতিদের প্রভাবিত করেছিল তা নয়। বাংলার জলবায়ুর উপযোগী এই গৃহশৈলী বিদেশি শাসকদেরও একসময় আকৃষ্ট করেছিল। তাই তাদের বিশ্রামগৃহ নির্মাণকালে বাংলার এই গৃহশৈলীর অনুকরণ করার জন্য সেগুলির নামকরণও করা হয় 'বাংলো' বা 'ডাকবাংলো'। একই সাদৃশ্যের কারণে দোচালাকুঁড়েঘরের আদলে নির্মিত দেবায়তনগুলিও বাংলারীতি থেকে 'একবাংলা' নামে অভিহিত হয়েছে। এরীতির মন্দিরগুলি আয়তাকার কুঠুরিযুক্ত চার দেওয়ালের দুপাশে কারিগরি দক্ষতায় আয়তাকার দুটি আচ্ছাদন চাল নেমে আসে। লক্ষণীয় বিষয় হল আয়তাকার চাল দুটির কার্নিশ হয় ধনুকের মতো বাঁকানো। বাঘডাঙার সূর্যেশ্বরমন্দির এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

জোড়বাংলা ঃ

দুটি দোচালাস্থাপত্যকে পাশাপাশি স্থাপিত করে নির্মিত মন্দিরকেই বলা হত জোড়বাংলামন্দির। বলা যেতেই পারে এই জোড়বাংলা শৈলী পূর্ববর্ণিত দোচালারীতিরই একটি পরিবর্তিত ও উন্নততর রূপ। এই শৈলীর অন্তর্ভুক্ত দুটি আয়তাকার দোচালাস্থাপত্যের সমান্তরাল অবস্থান শেষ পর্যন্ত মন্দিরের আসনটিকে বর্গাকারে পরিণত করে। জোড়বাংলার সামনে ত্রিখিলান প্রবেশপথের মাঝামাঝি পিছনের দেওয়ালেও একটি ঘেরা দেওয়ালপথ রাখা হত। যাতে পরবর্তী দোচালাকুঠুরিতে প্রবেশ করা যায় এবং সেখানেই অধিষ্ঠিত হতেন মন্দিরের উপাসিত বিগ্রহ। অন্যদিকে এই মন্দিরস্থাপত্যটিকে সুদৃশ্য করার জন্য বাংলার শিল্পীরা চালের ওপর সমান দূরবর্তী স্থানে প্রতিস্থাপন করত তিনটি ক্ষুদ্রকার চূড়া যার ধরনটি হত অবিকল খোড়োঘরের মটকায় নিবদ্ধ প্রথাগত খড়ের আঁটির গোড়ার দিকের অংশের মতো। আবার কখনও কখনও দুটি চালার মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হত চারচালা বা আটচালা অথবা নবরত্নরীতির ক্ষুদ্রাকার স্থাপত্যসৌধ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন জোড়বাংলাস্থাপত্যের উদাহরণ হল হুগলি জেলার গুপ্ত পাড়ার চৈতন্যদেবের মন্দির।

চারচালা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগ্রামান্তরে বসবাসের কুটির হিসাবে সর্বাধিক দেখতে পাওয়া যায় চারচালাছাদবিশিষ্ট মাটির বাড়ি। বলা যেতে পারে দোচালাছাদের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে এই চারচালার, যার সংক্ষিপ্ত ও সহজরূপ প্রকাশ করার ক্ষমতাও যেন বেশি এই রীতির কুটিরের। চারিদিকের দেওয়ালে নেমে আসে সমত্রিভুজাকৃতির চারটি ঢালুচাল। যার নীচের বহিঃরেখটি হয় ধনুকের মতো বাঁকানো। এই চারচালাকুটিরের আদলে বাঙালি স্থপতিরা যে রীতির মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু করেন, সেই রীতির মন্দিরের চারিদিকের চালে নমনীয় বক্ররেখাটির বন্ধন এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যা সৌন্দর্যবৃদ্ধির একান্ত সহায়ক। এই স্থাপত্যশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য মন্দির হল ঘাটালের সিংহবাহিনীর চারচালামন্দির।

সাধারণত এই শ্রেণির চারচালামন্দিরের ভিত্তিভূমি হয় বর্গাকার এবং প্রবেশপথও হয় একদুয়ারি। একদুয়ারি চারচালার এই উদাহরণ ছাড়াও ত্রিখিলান প্রবেশপথযুক্ত চারচালার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

আটচালা ঃ

বাংলার আটচালাকুটির হল চারচালাকুটিরের পরবর্তী পর্যায়। বঙ্গীয় মন্দিরস্থপতিরা প্রথাগত আটচালাকুঁড়েঘরের অনুকরণে নির্মাণ করেছেন আটচালারীতির মন্দির। এই রীতির মন্দির প্রসঙ্গে আসার আগে, খোড়োঘরের আদলে মন্দির নির্মাণরীতি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্যই এই স্থাপত্য ভাবনাটির সৃষ্টি হয়নি; এর পিছনে ছিল বহু পরিশ্রম, নির্মাণ ও কৌশলগত পরিকল্পনা যা স্থপতির কারিগরি চিন্তাভাবনার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

প্রাচীনকালে দুর্গাপূজার স্থান হিসাবে যে দোচালাচণ্ডীমন্ডপ নির্মিত হত তার সামনের চত্বরে স্থাপিত হত একটি আটচালামন্ডপ। যেখানে পুঁথিপাঠ, নৈবেদ্য প্রকরণ-এর প্রস্তুতি চলত; বাকি অংশে দর্শক ও শ্রোতারা সমবেত হতেন। চারচালার বদলে স্থপতিরা কেন এহেন আটচালামণ্ডপ তৈরি করতেন তার এক যুক্তিগ্রাহ্য কারণ এখানে দেওয়া যেতে পারে। বহু শ্রোতার একত্রে বসার প্রয়োজনে নির্মিত এই মণ্ডপটি চারচালা হিসাবে তৈরি করতে হত। তার আয়তন অনুযায়ী ওপরের চালকে করতে হবে খুব উঁচু এবং সেই সুউচ্চ প্রশস্ত কাঠামোটি বাঁশকাঠ দিয়ে তৈরি হওয়ার ফলে তেমন সুদৃঢ় না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। এই সব অসুবিধা বিবেচনা করে বাংলার স্থপতিগণ উদ্ভাবন করলেন আটচালারীতির। প্রথমে ভূমিনকশার মধ্যে উঁচু করে চারচালা এবং পরে সেই চারচালার ধালের সঙ্গে সমতা রেখে এবং চালের সামান্য নীচু থেকে চারিদিকে ফাটাচাল জুরে দিয়ে তৈরি হয় আটচালাস্থাপত্য। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় স্তরটি অপেক্ষাকৃত আয়তনে ছোটো হত। এই রীতি কেবলমাত্র বহিরঙ্গ সজ্জার সৌন্দর্যবৃদ্ধি আবার কোথাও কোথাও উচ্চতা অর্জনের জন্য নির্মিত হত। উল্লেখ করার বিষয় এই রীতির প্রকরণের মন্দিরের ক্ষেত্রে ওপরের ও নীচের চালগুলির কার্নিশ হয় সাধারণত চারচালার মতন এবং এই শৈলীর অধিকাংশ মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখভাগে দেখা যায় ত্রিখিলানযুক্তদালান। আবার কোথাও দালান ছাড়াই

একদুয়ারি প্রবেশপথ থাকে। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে আটচালামন্দিরের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবাংলার একক আটচালামন্দির ছাড়াও পাশাপাশিভাবে নির্মিত জোড়া আটচালামন্দিরও দেখা যায় যা সাধারণ্যে জোড়ামন্দির নামে পরিচিত।

বারোচালা ঃ

গ্রামবাংলার বহুস্থানে আটচালার মতো বারোচালার কুটিরও দেখা যায়। যার অনুকরণে মন্দিরস্থপতিরা বারোচালারীতির মন্দির নির্মাণেও পরাঙ্মুখ হননি। ভূমিনকশায় বারোচালার মন্দির আটচালার মতনই বর্গাকার এবং আটচালার ওপরভাগে তৃতীয় স্তরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো চারচালা নির্মাণ করে সেটিকে বারোচালার রূপ দেওয়া হত। তবে এই রীতির মন্দির সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় খুব কম।

গ্রামীণ মানুষের অবহেলা ও ঔদাসীন্যে এবং বঙ্গীয় কৃষ্টির এই মহামূল্যবান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুণ উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু মন্দির ও স্থাপত্য আজ বিলুপ্ত এবং প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্যতম সংস্কার না করার ফলে আজ বেশ কিছু মন্দির বা স্থাপত্য ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এইসব কৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আজ (আমরা) অস্বীকার করতে পারি না। কারণ বাংলার মহৎ কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাহক এই স্থাপত্যগুলি। তাই প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও যেসমস্ত স্থাপত্য এখনও টিকে আছে তাকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ্যে সচেতনতার বিস্তার প্রয়োজন। তাহলে এই বঙ্গীয় কৃষ্টির মহামূল্য নিদর্শনগুলি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হতে পারে এবং এই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উদাহরণ থেকেই বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির সাধারণ ইতিহাস সম্পর্কে ভবিষ্যৎপ্রজন্ম প্রেরণা ও শিক্ষালাভে সক্ষম হবে।

মন্দিরবর্ণনা ঃ

১. একচালামন্দির — মেদিনিপুর জেলার বলরামপুরের 'সীতারামমন্দির (১৮৬০-৬১), আদলাবাদের 'রাধারমণের মন্দির'।

২. দোচালামন্দির — মুর্শিদাবাদ বড়নগরের 'পঞ্চানন শিবমন্দির'।

৩. জোড়বাংলা — হুগলীর গুপ্তপাড়ার 'চৈতন্যদেবের মন্দির'।

৪. চারচালা —ঘাটালের 'সিংহবাহিনীমন্দির', মুর্শিদাবাদ-এর 'নৃসিংহমন্দির (১৫৮৪)', বিষ্ণুপুরের 'ঝামাপাথরের বাসুদেবমন্দির (১৬২৬)', মেদিনিপুরের 'বিশালাক্ষীমন্দির (১৯৬৩)', বীরভূমের 'ডাবুকেশ্বরমন্দির (১৮৮১)', নদিয়ার 'রাজেশ্বর শিবমন্দির (সম্ভবত ১৮ শতক)'।

৫. আটচালা — হুগলির 'রাধাবল্লভমন্দির (১৯৬৪)', হাওড়ার 'মদনগোপালমন্দির (১৬৫১)', কলকাতার হাটখোলার 'দুর্গেশ্বর শিবমন্দির (১৯৯৪)', আদিগঙ্গার তীরে সুবর্ণ চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত মন্দির,

ব্যারাকপুরে রাণীরাসমণীর কনিষ্ঠ কন্যা করুণাময়ী-এর প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণামন্দির ও বর্ধমানরাজ প্রতিষ্ঠিত বর্ধমান জেলার কালনায় একশ নয়টি আটচালাশিবমন্দির (১৮০৯)।

৬. বারোচালা — উনিশ শতকের মেদিনীপুরের 'নতুন জয়কৃষ্ণমন্দির', হুগলির 'ইলছোবামন্দির', মুর্শিদাবাদের 'সাহানগরমন্দির' প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র ঃ

বিষ্ণুপুরমন্দির ঃ টেরাকোটা - চিত্তরঞ্জন দাসগুপ্ত

কলকাতার পুরাকথা - দেবাশিস বসু

বাংলার মন্দির - পঞ্চানন রায়

পশ্চিমবাংলার ধর্মীয়স্থাপত্য - তারাপদ সাঁতরা

চিত্র ঃ

অনুসন্ধান ব্লগ - শুভজিৎ দে (ITIHASANUSONDHAN.BLOGSPOT.COM)

এছাড়াও কিছু বিষয়ভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা।

> ''কোনও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।''
>
> — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলেজের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা

অরিজিত মিত্র
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

তারিখটা ছিল ২০-শে জুলাই ২০১৭, ঘড়িতে তখন ১০টা বেজে ২০ মিনিট। দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল আমার কলেজ — নীল রঙে রাঙানো 'নিউ আলিপুর কলেজ'। কলেজে ঢুকে যখন জিজ্ঞেস করলাম বাংলা বিভাগের জন্য কোন রুমে যাব তখন আমাকে দাদারা বলল ৪০৯ নম্বর রুমে যেতে। মনে একরাশ আনন্দ নিয়ে চললাম ৪০৯ নম্বর রুমের দিকে। গিয়ে দেখি অনেক অচেনা বন্ধুরা বসে আছে। এরপর সাড়ে দশটা বাজতেই আমাদের ক্লাসে এলেন বাংলা বিভাগের প্রধান, সকলের প্রিয় অধ্যাপিকা শিতি কুমারী কুণ্ডু ম্যাডাম, তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলে সকলকে তিনি নাম ও কোন স্কুল থেকে আমরা এসেছি তা জিজ্ঞেস করলেন। তারপর কলেজে প্রথম দিন হওয়ায় রুটিন দিয়ে কিছু কাজের কথা বলেই ছেড়ে দিলেন।

এরপর আমাদের পরিচয় হল আর একজন প্রিয় ম্যাডামের সাথে, তিনি হলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা নির্মাল্য মন্ডল মহাশয়া। তিনি যখন ক্লাসে এলেন ভাবলাম, খুব রাগি হবেন হয়তো! ক্লাসে এসেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন যাতে অন্য কেউ আমাদের অন্যমনস্ক করতে না পারে। এই দেখে ভাবলাম ম্যাডাম বোধহয় খুব রাগি! কিন্তু আমার এই ধারণা পুরোপুরি ভ্রান্ত প্রমাণিত হল। ম্যাডামের কোনো রাগ-ই নেই।

এরপর আরও একজন অধ্যাপকের কথা না বললেই নয়; তিনি হলেন অধ্যাপক রাজদীপ দত্ত। তাঁর সাথে আমাদের সকলের পরিচয় হল। তাঁকে দেখেও প্রথমে ভয় লেগেছিল; সে ধারণাও পাল্টে গেল। স্যার আমাদের খুবই ভালো মানুষ। ম্যাডামদের ও স্যারের সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগল।

এখানেই শেষ নয়; আলাপ হল বন্ধুদের সাথেও। প্রথম যে বন্ধুদের সাথে পরিচয় হল তারা হল সুস্মিতা রক্ষিত, দীপাঞ্জন মল্লিক, রোদোসী রায়, স্বরূপ নস্কর, নেহা মিত্র প্রমুখ। আরও অনেক বন্ধুর সাথে পরিচয় হল যারা অন্যান্য বিভাগে পড়ে।

তারপর পরিচয় হল আমাদের কলেজের সকলের প্রিয় ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী নীলেশ মাহাতো দাদার সঙ্গে। তারপর আরও অনেক দাদাদিদিদের সাথে পরিচয় হওয়ায় খুব ভালো লাগল। এভাবেই কাটল কলেজের প্রথম দিনটা।

প্রথম দিনের কলেজের অভিজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠেছিল। অপেক্ষা করেছিলাম পরের দিন আবার কখন সাড়ে দশটা বাজবে! আবার আমি কলেজে পৌঁছাব। আশা জেগেছিল আগামী তিন বছর এইভাবেই সুন্দর ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কেটে যাবে। লিখতে বসে অনেক কথাই মনে আসছে, হয়তো কলেজ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন সব দিনের প্রতিটি ঘটনা আর স্মরণে থাকবে না। তবে আমি নিশ্চিত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে আমার ঝুলি। আর প্রথম দিন — ২০-শে জুলাই ২০১৭, তার কথা মনে রাখব আমরা সকলেই, কখনোই ভুলব না, ভুলতে পারব না।

এইভাবেই আমাদের চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে থাকবে আমাদের কলেজ — 'নিউ আলিপুর কলেজ'।

The Magic of Lothal

Dr. Srabani Datta
Assistant Professor
Department of History

For the Avensis 2017 organised by the New Alipore College, the students of the History Department chose Lothal for the exhibition competition. Next to Harappa and Mohenjodaro, Lothal is one of the most prominent cities of the ancient Indus Valley Civilisation. The reason for choosing Lothal as their topic was that the world's earliest known dock was excavated in this region and as such this place was an important centre of trade between the Harappen cities in Sindh and the peninsula of Saurashtra. This thriving trade centre was known for its trade of beads, gems and valuable ornaments reaching the far corners of West Asia and Africa. The techniques and tools they pioneered for bead making and in metallurgy have stood the test of time for over 4000 years.

Lothal was discovered in 1954 AD. It was excavated from 13th February 1955 to 19th May 1960 by the A.S.I. It is situated near the city of Saragwala in the Dholka Taluka of Ahmedabad district. Resuming excavation in 1961, the archaeologists unearthed trenches sunk in the northern, eastern and western flanks of the mound, bringing to light the inlet channels and nullah connecting the dock with the Sabarmati river. The findings consist of a mound, a township, a marketplace and a dock. The site of Lothal has been nominated as a UNESCO World Heritage Site.

Like Mohenjodaro, the meaning of the word 'Lothal' (Loth + (s) thal) in Gujrati is 'the mound of the dead.' Before the arrival of the Harappan people (c 3000 BCE), Lothal was a small village next to the river providing access to the mainland from the Gulf a Khambhat. The indigenous people maintained a prosperous economy attested by the discovery of copper objects, beads and semi-precious stones. The Harappans were attracted to Lothal for its sheltered harbour, rich cotton and rice growing environment and bead making industry. The beads and gems of Lothal were coveted in the West. Lothal copper is unusually pure lacking the arsenic typically used by the copper smiths across the rest of the Indus Valley. Workers mixed tin with copper for the manufacture of celts, arrowheads, fishhooks, chisels, bangles, rings, drills and spearheads although weapon manufacturing was minor. They used advanced metalligical techniques and invented new tools such as curved saws and twisted drills unknown to other civilisations at that time. Lothal was one of the most important centres of productions for shell-working owing to the albundance of chank shell of high quality found in the Gulf of Kutch and near the Kathiawar Coast.

The discovery of etched carnelian beads and non etched barrel beads in Kish and Ur (modern Iraq), Jalalabad (Afghanistan) and Susa (Iran) attest to the popularity of the Indus bead industry across West Asia. The methods of the Lothal bead makers were very advanced that no improvements have been noted over 4000 years. It is interesting to note that modern bead makers in the Khambat area also follow the same technique. Double *eye* beads of agate and collared or gold capped beads of jasper and carnelian beads are among those attributed as uniquely from Lothal.

The Lothal excavation has brought to light about 213 seals. Seals of rulers and owners were stamped on goods. A unique seal found here is from Bahrain showing contacts with that region.

Lothal offers two new types of potter work, a convex bowl with or without stud handle and a small jar with flaring rim, both in micaceous Red Ware period, not found in contemporary Indus cultures, Lothal artists introduced a new form of realistic painting. Paintings depict birds and animals in their natural surroundings. The realistic portrayal of human beings and animal suggests a careful study of anatomical details and natural features. Terracotta models are very common. Animal figures with wheels and movable head may have been utilised as toys.

A flood destroyed the village foundations of Lothal in about 2350 BCE. As the settlements were ruined, the Harappans based around Lothal and from Sindh took the opportunity to expand their settlement and create a planned township on the lines of the major cities of the Indus Valley. The city was divided into a citadel, an acropolis and a lower town. The rulers of the town lived in the acropolis which had paved baths, underground and surface drains and a potable water well. The lower town had a commercial area flanked by shops of rich and ordinary craftsmen. The residential area was located on either side of the market place. The lower town was also periodically enlarged, during Lothal's years of prosperity.

Lothal engineers accorded high priority to the creation of a dockyard and a warehouse to serve the purposes of naval trade. Another view is that it may have been an irrigation tank and canal. The dock was built on the eastern flank of the town and is regarded by archaeologists as an engineering feat of the highest order. It provided access to ships in high tide as well. The ware house was built close to the acropolis to enable the rulers to supervise the activity on the dock and warehouse simultaneously. All the construction were made of fire-dried bricks, lime and sand mortar and not by sun dried bricks as bricks are still intact after 4000 years and still bonded together with each other with the mortar bond.

The uniform organisation of the town and institutions give evidence that the Harappans were a very disciplined people. Municipal administration was strict. Drains, manholes and cesspools kept the city clean and deposited the waste in the river. Metalware, gold jewellery and tastefully decorated ornaments attest to the culture and properity of the people of Lothal. The people of Lothal worshipped a fire god, speculated to be the horned deity depicted on seals which is evidenced by the presence of private and public altars where religious ceremonies were conducted. The citizens of Lothal also practised the cremation of the dead.

The declinig prosperity of the town, the paucity of resources and poor administration increased the woes of a people pressured by consistent floods and storms. The salinity of the soil increased and the land became inhospitable to life including crops. A massive flood (C 1900 BCE) completely destroyed the town in a single stroke. the basin and the dock were sealed with silt and debries and the buildings razed to the ground. The population fled to the inner regions. Our students very meticulously portayed Lothal in its heyday and Lothal in ruins by making models of the town and the crafts. Their efforts were rewarded with the first prize in the exhibition category.

> ''History is the historian's experience; it is made by nobody save the historian; to write history is the only way of making it.''
>
> **— Michael Oakeshott**

My Living City

Dr. Dhrubajyoti Banerjee
Assistant Professor
Department of English

Just like others, I have to do a lot of travelling across the City. There is a thought that keeps haunting me as I travel in public transport or walk or drive though crowded streets. I wonder what is going on in the minds of the unknown individuals that I see all around me. I had read somewhere that all individuals are silently fighting their own battles and this had intrigued me further.

A standard way of representing the metropolis of contemporary times is to paint it as being impersonal. We are always bombarded with news of incidents where individuals have had to see the indifferent face of the City. But I would like to take this occasion to share three disjointed incidents that I have experienced in the place that I call my hometown. They are casually collated but they speak a lot of the human touch that many think has deserted our lives.

I

In a room on the ground floor of the building next to our home, a couple try to make both ends meet by ironing clothes from households in our locality. Often we find this couple being visited by relatives from their native village. As one small room which they can call their own is spatially insufficient for them let alone for their visitors, most of the time the visitors are found sitting in the open passages of the building. A couple of days back I happened to wake up early only to find two kids (who had come to visit this couple from the village) engrossed in their school homework. They had nicely spread a bed sheet on the floor and were completing exercises given in school. The neat and clean school bag and nicely covered books and exercise books spoke a lot about their commitment towards studies. It added an extra amount of freshness to my morning. While looking at those young children engaged in studies I felt that they were indeed taking small steps towards empowerment. I hoped and prayed that they never lose this zeal for learning as life itself would surely come up with economic challenges greater than the ones that we have to face. But if they succeed, they would surely be able to live a better life in the future. As a person committed to the spread of learning, I felt good but I also alerted myself to the fact that people like us have a great responsibility in ensuring that talent and potential should never be wasted. In a world filled with attempts to commodify education, this little incident reminded me of the pristine nature of the vocation.

II

In the market some weeks ago, I experienced something very interesting. A middle aged lady was buying flowers from a vendor close to where I happened to be standing. As was natural, she had a smart phone in her hand and was engaged in a video call with someone. I had a memory of a person I had seen on a crowded metro desperately trying to surf content on social media with one free hand while the other was grabbing the handle in the coach. With the usual impatience that I have for these compulsive and addictive behaviours, I had mentally placed this elderly lady in the market along with the individuals obsessed with social media. Suddenly I realized that she was talking to a child on video call. Soon the call got disconnected and I heard her relate to the shop owner (she seemed a regular customer) of how her grandchild who lives in another city loves to chat with her online and the smart phone is a way in which she can *see* her grandchild. She went away and I thought that technology does indeed help many to overcome loneliness and be in touch with loved ones. In this contemporary world of shrinking distances, loved ones living in other cities if not countries, has become the order of the day. Technology helps in connecting these spatially separated individuals. That evening, the market place seemed suddenly to have become beautiful and the grandparent's joy at having interacted with the grandchild brightened the street a lot.

III

At traffic signals we all have noticed young children approaching car windows with packets of agarbatti. Without any idea of how they would smell, they generally meet with very little success. Moreover, most of the air conditioned cars with window shields rolled up are not accessible to these children. Once I saw a man call such a child near his car window. He placed some currency notes in the child's hand. The face of the child lit up and as he was about to give this man an equal amount of agarbattis the man stopped the child. With a warm smile on his lips he said that he did not need the agarbattis. The child might as well try to sell them to others. Having said that, the car drove off. Cynics would argue that this does not solve the malaise of poverty in any way. But I felt kindness that day, a little effort to do good, to be compassionate in a small way. The act was humane and that was what was important.

We have been taught that small stories are more interesting than larger and bigger narratives because in a bid to identify tendencies, larger narratives lose out on the human element. The sharing of these stories was not done with any intention to prove anything and the readers are free to make their own interpretations. But somehow I feel that there is goodness left in this world and we only need to look around us to find it. After all it is only one life that we have .... why not make it beautiful for ourselves and others?

Decoding the inherent pattern of Nature : The Golden Ratio

Prof. Debarati Das
Assistant Professor
Department of Botany

Around 1200 AD, mathematician Leonardo Fibonacci discovered the unique properties of the Fibonacci sequence. This sequence relates directly with the Golden ratio because if you take any two successive Fibonacci numbers, their ratio is very close to the Golden ratio. As the numbers get higher, the ratio becomes even closer to 1.618. For example, the ratio of 3 to 5 is 1.666. But the ratio of 13 to 21 is 1.625. Getting even higher, the ratio of 144 to 233 is 1.618. These numbers are all successive numbers in the Fibonacci sequence.

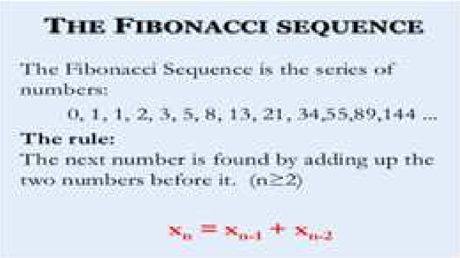
THE FIBONACCI SEQUENCE

The Fibonacci Sequence is the series of numbers:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,55,89,144 ...

The rule:
The next number is found by adding up the two numbers before it. $(n\geq2)$

$x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$

The Golden ratio is a special number found by dividing a line into two parts so that the longer part divided by the smaller part is also equal to the whole length divided by the longer part. It is often symbolized using phi, after the 21st letter of the Greek alphabet. In an equation form, it looks like this:

a/b = (a+b)/a = 1.6180339887498948420 …

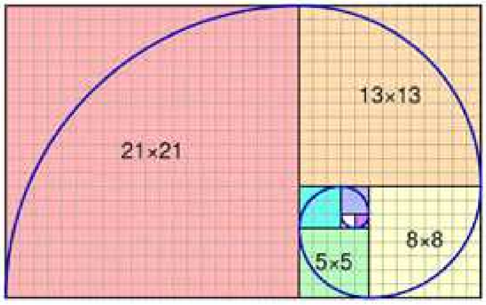

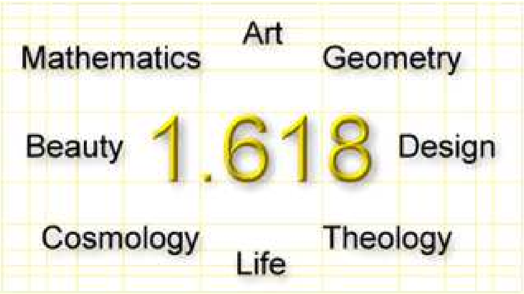

Phi is more than an obscure term found in mathematics and physics. It appears around us in our daily lives, even in our aesthetic views. Studies have shown that when test subjects view random faces, the ones they deem most attractive are those with solid parallels to the Golden ratio. Faces judged as the most attractive show Golden ratio proportions between

the width of the face and the width of the eyes, nose, and eyebrows. The test subjects weren't mathematicians or physicists familiar with phi — they were just average people, and the Golden ratio elicited an instinctual reaction.

The Golden ratio was used to achieve balance and beauty in many Renaissance paintings and sculptures. Da Vinci himself used the Golden ratio to define all of the proportions in his Last Supper, including the dimensions of the table and the proportions of the walls and backgrounds. The Golden ratio also appears in da Vinci's Vitruvian Man and the Mona Lisa. Other artists who employed the Golden ratio include Michelangelo, Raphael, Rembrandt, Seurat, and Salvador Dali.

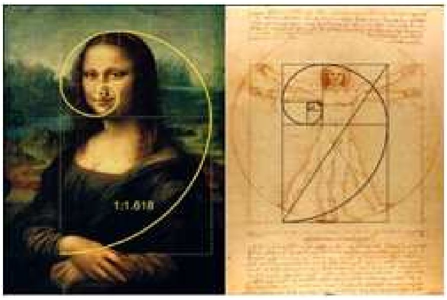

The Golden ratio also appears in all forms of nature and science. Some unexpected places includes the following :

Fig.: Images showing incorporation of the Golden Ratio.

Flower petals: The number of petals on some flowers follows the Fibonacci sequence. It is believed that in the Darwinian processes, each petal is placed to allow for the best possible exposure to sunlight and other factors.	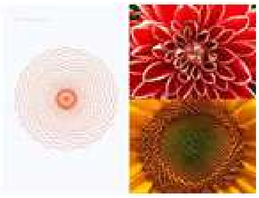
Seed heads: The seeds of a flower are often produced at the center and migrate outward to fill the space. For example, sunflowers follow this pattern.	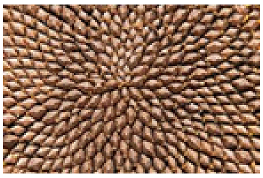
Pinecones: The spiral pattern of the seed pods spiral upward in opposite directions. The number of steps the spirals take tend to match Fibonacci numbers.	
Tree branches: The way tree branches form or split is an example of the Fibonacci sequence. Root systems and algae exhibit this formation pattern.	
Shells: Many shells, including snail shells and nautilus shells, are perfect examples of the Golden spiral.	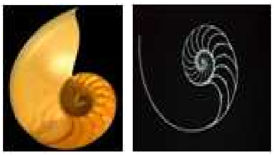
Spiral galaxies: The Milky Way has a number of spiral arms, each of which has a logarithmic spiral of roughly 12 degrees. The shape of the spiral is identical to the Golden spiral, and the Golden rectangle can be drawn over any spiral galaxy.	
Hurricanes: Much like shells, hurricanes often display the Golden ratio.	
Fingers: The length of our fingers, each section from the tip of the base to the wrist is larger than the preceding one by roughly the ratio of phi.	

Animal bodies: The measurement of the human navel to the floor and the top of the head to the navel is the Golden ratio. But we are not the only examples of the Golden ratio in the animal kingdom; dolphins, starfish, sand dollars, sea urchins, ants and honeybees also exhibit the proportion.	
DNA molecules: A DNA molecule measures 34 angstroms by 21 angstroms at each full cycle of the double helix spiral. In the Fibonacci series, 34 and 21 are successive numbers.	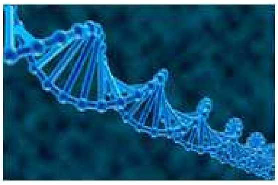

To conclude one can quote the famous scientist Albert Eienstein ......

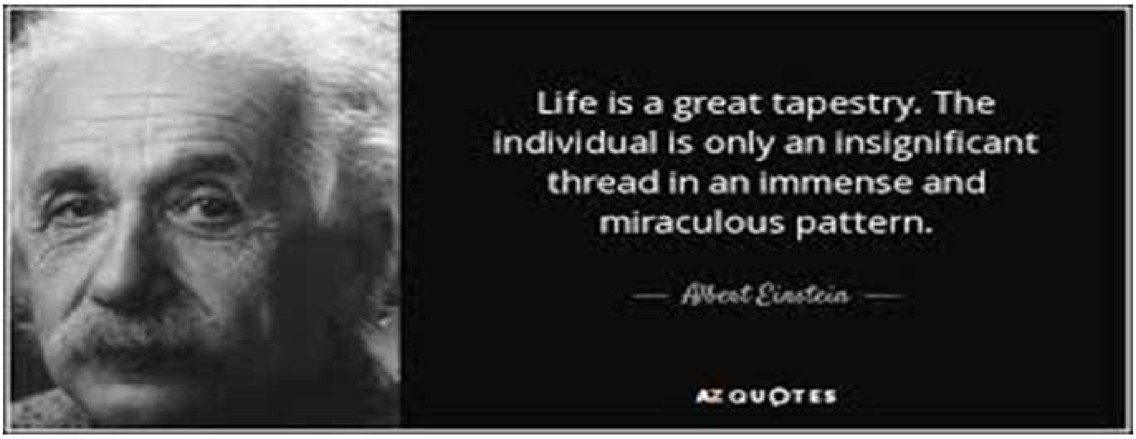

The Echoes of 'Silent Spring'

Dr. Mohsina Iqbal
Assistant Professor
Department of Botany

"Our heedless and destructive acts enter into the vast cycles of the earth and in time return to bring hazard to ourselves," these words by Rachel Carson probably brought into the forefront the harmful effect of pesticides and aroused environmental consciousness to such an extent which no other single work by any author has done till date. Born on 27th May 1907 in Springdale, Pennsylvania, Rachel Carson was an outstanding student, often praised by her teachers. She studied English at Pennsylvania College for Women in Pittsburgh but changed her discipline due to her love for nature. She studied creative writing at John Hopkins University and earned a masters degree in the subject. She also completed a Master's Degree in Zoology from the same University in 1932. She served as a marine biologist in the Bureau of fisheries, US in 1936 when she published her first book "Under the Sea Wind". Her fascination and love for nature was evident in her bestseller book "The Sea Around Us" which was translated into 30 languages. For this book Carson received the National Book Award and the Gold Medal of the New York Zoological Society. Her extensive research work brought about the publication of the 'Silent Spring' which explained how indiscriminate application of agricultural chemicals, pesticides, and other modern chemicals polluted our streams, damaged bird and animal populations, and caused severe medical problems for humans.

The book begins with a fictional chapter of an unnamed American town living in harmony suddenly struck by a mysterious disease. It talks about a white powder being sprayed over the land causing sterility in orchard trees, streams being devoid of fish and birds falling sick. Later on the book slowly reveals the common pesticides or chemicals that do not kill outright but accumulate in the fat tissues and can be carcinogenic and can cause a heritable change. A detailed account of case studies like wiping out a population of Japanese Beetles due to spraying of Aldrin in Detriot, decline in the robin population due to their feeding on the bark of trees which had been sprayed with chemicals etc. has been incorporated in the book. In the concluding chapter Carson calls out not for an outright ban on pesticide but for caution, further study and for biological alternatives.

Before the publication of the book, Carson was fully aware of the criticism she would receive especially from the pesticide industry who would feel threatened and try to discredit her work. Her fears proved to be right when thousands of US dollars were spent by the

critics in the chemical industry to refute her claims in the book. She was given the title of a cat lover, a fish lover, a priestess of nature and a poor scientist by her critics. They even published a book 'Desolate Year' explaining how the world would be on the brink of extinction without pesticides. But Carson's work was so lucid and her topics so engrossing that it became the bestseller. It brought about a sea change in environmental consciousness—people wrote to the congress to stop the misuse of pesticides. The Research and Advisory Committee on Environmental Dangers constituted by President Kennedy published a report on The Uses of Pesticides which supported the views of Silent Spring. In 1970 finally Environment Protection Agency (EPA) came into being . They formulated policies to protect air, water and ultimately public health and safety. Environmental activists also won the battle of the ban on pesticides DDT, the chemical that started the research on Carson's Silent Spring.

Carson's book therefore continues to be a pioneer on the ideas of ecological awareness, environmental protection and conservation. It does not simply portray the harmful effects of chemicals but also provides a bird's eye view of the chemical used in aerial spray, their impact on the ecological food chain. The legacy of silent spring paved way to green chemistry, eco friendly pesticides and sustainability in all areas of life.

"The Earth does not belong to us, We belong to the Earth."

— Marlee Martin

'City of Joy' or 'Unreal City'? : Exploring the Cityscape in Mrinal Sen's *Interview*

Prof. Victor Mukherjee
Department of English

> Calcutta is a city of glaring contrasts and that is me – restless, nervous, unpredictable, intimidating, infernal; and I have grown in this state of confusion, this chaotic situation. Calcutta excites me, Calcutta provokes me, Calcutta inspires me, Calcutta gives me a lot of intellectual food, Calcutta is something which irritates me and saddens me, Calcutta acts like a stimulant and as a provocation. Wherever I go, wherever I work, whether it is inside Calcutta or outside, even in the remotest part of the South, or maybe in the North or in the West, I carry the spirit of Calcutta with me: I call Calcutta my El Dorado. (Bandyopadhyay and Katyal 3)
>
> - Mrinal Sen, *Ten Days in Calcutta: A Portrait of Mrinal Sen* (1987)

Born in Faridpur in the year 1923, Mrinal Sen grew up through the climactic decades of the Indian Independence Movement. He was the son of a nationalist lawyer in a town noted for the affinity with the extremist side of the freedom struggle. During the forties, Sen got involved with the IPTA, a communist cultural organisation that gave him close contact with the common people as well as with artists who shared his political outlook and humanitarian social philosophy. The forties, of course, were momentous years in Bengal marked by political agitation, communal carnage and the tragedy of Partition, but it was the appalling devastation wrought by the Bengal Famine in 1943 that had the single most indelible effect on the twenty year old Sen, an effect which was to last throughout his life, at the background of all his social and political thinking, and have a significant effect on several of his films, notably *Baise Sravan* (1960), *Calcutta 71* (1972) and *Akaler Sandhane* (1980).

Towards the end of the colonial period, Bengal had progressively lost prominence in national politics. The glory days of the cultural 'Renaissance' of the early 19th century were over and a gradual but steady phase of disillusionment was beginning to set in. Moreover, factors like the refugee crisis and the debilitating man-made Bengal famine of 1943 made matters worse. It is interesting to note that the dominant forms of art in Post-Partition Bengal began to focus upon the cityscape as a space of disillusionment, growing unemployment, crushed ideals and unfulfilled dreams. Several films directed by Mrinal Sen have Kolkata as their backdrop. In the book, *Montage: Life. Politics. Cinema* (2002), Sen observed:

> It was early 1970s that the very air in Calcutta seemed to crackle with anger. That was period when I made three films in three successive years – *Interview*, *Calcutta 71* and *Padatik*. They were justifiably, angry and restless… and in varying degrees, both passionate and blatant. That was when my team and I could not escape the pressures of our times. That was when we affirmed our condition to rebellion. All this perhaps reads like a pamphlet but that was our reality. (Sen 100)

The reality of Kolkata's topography, its people and its social life are projected in Sen's *Interview* (1971), *Calcutta 71* (1972) and *Padatik* (1973). The lead characters in the films offer a microcosm of the upper-middle class and middle-class people of Kolkata. Their dreams come across, merged with their struggles to overcome the hurdles that come in the way of these dreams. The character of the city kept evolving in Sen's films in keeping with the real changes that swept through it over time. Kolkata in his films goes beyond being a mere physical presence. His films show his desire to go deep into the mindset and psyche of the city, to capture its core and its essence. Interestingly, some of his films place characters against the backdrop of the city and try to explore the mutual influences and interdependence of the city on the characters.

When Mrinal Sen made the film *Interview* (1971), Kolkata was going through some of its most turbulent times in history. *Interview*, the first in a group of three Bengali films that dealt with the political challenges experienced particularly in Kolkata in the early seventies. This was a period of political and social turbulence caused by the Naxalite agitation, a largely youthful and idealistic movement claiming authority from Maoist doctrines and deferring to the leadership of the Communist Party of India (Marxist-Leninist); the turbulence was in a small way due to the brutally repressive reaction to it by the forces of the establishment, especially during the Emergency rule during the middle of the decade.

Sen's *Interview* explores the journey – physical, emotional and metaphorical – of a young man through the streets of Kolkata from one morning to late night, hunting for a proper suit to be worn for an interview. The camera in this film turns into an investigative journalist, a social and political observer and finally, a silent commentator on the way things are for some serious minded young people in a milieu where most youngsters are misled by extremist aspirations of changing the world through the mouth of the gun. It follows a neat and appealing story about a young unemployed man whose hopes in seeking work enhanced by the promise of a job interview. Indeed, there is no potential for drama in this, for all he has to do is attend – appropriately dressed; it is in regard to this relatively trivial precondition that the narrative so entertainingly unfolds, for Ranjit Mallick, the central character of the

film, has first to collect his only suit from the dry cleaners. The initial hurdle to be crossed is the domestic crisis which ensues when he cannot find the dry cleaning docket, but this proves to be not all dramatic when he takes it to the shop and finds that dry cleaners and laundry workers throughout the city are on strike and that he cannot even get into the shop to beg for, or even steal, his suit. In good narrative fashion hope does not dwindle early, so that things get better before they get worse, and a friend offer offers to lend him a suit. Again, it would seem that the film's end is high, except that Ranjit leaves the suit on a bus in the commotion that evolves out of his nobly apprehending a pickpocket and giving evidence against him at the police station. Ranjit's concern for honesty is rewarded, perversely, by the disappearance of his friend's suit, and with only hours to go to the interview his desperation becomes acute as an attempt to fit into a suit of his late father proves comically unsuccessful. And then, with no real alternative, he decides to attend the interview in national dress – clean, smart and truly Bengali – a move which turns out to be decidedly inappropriate, however, the moment he enters the interview room and sees his potential masters all dressed in western-style suits. Needless to say, he does not get the job.

Mrinal Sen was quite successful in establishing a suitable cinematic context for the playing out of the conflict between nationalist and colonialist values in his film, *Interview*. This film depicts the passing of Imperialism in the removal of statues of the agents of the British Raj from Kolkata's public places, one especially significant image being that of a representation of a seemingly vice-regal personage lying prone in the back of a truck with a rope, noose-like, around its neck, being taken away from the public gaze. A close-up of a cannon reminds us that empires are won by conquest and held by force, yet the Victoria Memorial outside which the cannon stands continues to dominate the southern end of the Maidan and the colonial style of architecture was not, in 1970, particularly threatened by developers. Counter to this imagery is that which suggests a nationalist or, more specifically, Kolkatan perspective. The camera on a truck moves through a quiet winding Kolkata street, and while it is typical of the city, it is not easy to forget that the architecture is the product of a colonialist experience. More mundane images lend intensity to the pictures: washing the clothes, hanging them in the balconies, tea being made on a charcoal burner, the chaotic local fish market, traditional Indian sculpture and some scroll drawings of a Bengali babu winding a dhoti, taking betel leaf.

The structure of the film leaves its linear, narrative style and evolves into an anti-narrative abstraction suffused with concrete images in keeping with the seething, simmering and bursting anger of the hero who becomes as microcosm of the city, simmering and seething with the restive anger of its frustrated youth. He smashes a show window and strips a suited

mannequin inside, symbolising rebellion against the colonial mindset that insists on an English being won at an interview long after India's Independence. Cut to a battle-cry of *Inquilab Zindabad* on the soundtrack with a collage of visual flashing on screen showing slogan-raising masses in procession, zeroing in on protesting fists and faces. The spirit of Kolkata explodes and the creative integration of the maker with his milieu is complete. Kolkata becomes not just the backdrop, but the mirror of the film's theme. It is interesting to note that Mrinal Sen largely followed a pattern, not cinematic but ideological, of getting characters influenced by the director's ideology and asking questions that represented the most significant socio-political and cultural issues of his contemporary times. Sen as a director traced the social and political ferment of India with greater audacity than any other Indian filmmaker. He mirrored class conflict as much as middle-class angst. Kolkata played the role of a catalyst for him in tracing the evolving political ideology and social consciousness in those turbulent years of Indian history.

Works Cited

Bandyopadhyay, Samik and Anjum Katyal. *Ten Days in Calcutta: A Portrait of Mrinal Sen*. Kolkata: Seagull Books, 1987. Print.

Sen, Mrinal. *Montage: Life. Politics. Cinema*. Kolkata: Seagull Books, 2002. Print.

> ''For years and years, even during the time of my first visit in 1962, it has been said that Calcutta was dying, that its port was sitting up, its antiquated industry declining, but Calcutta hadn't died. It hadn't done much, but it had gone on.''
>
> — V. S. Naipaul

The Migratory Birds — and their incredible flight...

Sanchari Bhattacharyya
B.Sc., 2nd Year
Zoology Honours

The outset of the winters the month October is indeed pleasant and enjoyable. During this moderate climate we feel relaxed and usually enjoy deep slumber at night. But during this season, there is a part of the world where a lot of hustle bustle is going on far away in the cold and desolate are of Tibetan plateau and Siberia, the birds like Siberian Cranes and geese start feeling the urge of moving away from that part of the world to a safer place in the south as unbearable cold is stealthily setting in.

The amazing senses of these stupendous birds warn them against this deadly cold. Now the head off the flock give green signal and they'll flap their wings to get ready for a long journey of two thousand kilometers southwards towards Pong Dam in Himachal Pradesh. The journey isn't simple and direct at all. They fly over the ranges of Himalayas and many countries. The journey is considered to be the most dangerous and difficult journey in the world. At times they fly at a height of 26,000 feet where temparature is –40°C and there is very minimal oxygen. They continue their flight at night also where the stars may guide their way.

The arrival of these bird at Pong Dam or the Beas Dam in Himachal Pradesh is welcomed by all over the country and also by the world. Bird watchers and normal people come here to watch them for the next 6 months. Various species of migratory birds make Pong Dam their home and also their breeding space for the time being. And why not, if someone glances at their long journey, they would certainly treat them as most revered guest. They're joined by different part of the world.

During spring season, it's time to bid them goodbye. These geese again flap their wings and set out for a long journey back home once again. And they return back to Tibet. their foresightedness and prudence can be seen as they set out for their migratory journey exactly at the appropriate time. The target of their journey is also set and not aimless. Their perfect timing and calculation is really appreciative and amazing.

The gaggle of this geese move in a synchronised and symmetrical way. This further shows the sense of belongingness. The flight also proves of their determination and discipline. If this birds from cold and desolte part of world can show a long list of disciplinary actions and etiquettes then why having the advanced brains, humans fails to do so. It's time to sit and think !

Mangroves

Arko Sengupta
B.Sc., 2nd Year
Botany Honours

Mangrove forests or swamps can be found on low, muddy, tropical coastal areas around the world. Mangroves are woody plants that form the dominant vegetation of mangrove forests. They are characterized by their prop roots, their ability to tolerate regular inundation by salt water, and by precocious (pre-dispersal) germination of their seeds and development of their seedlings. Woody plants sharing these adaptations are all called mangroves although not closely related; the mangroves belong to Rhizophoraceae, Meliaceae, and Verbenaceae.

Mangrove forests form along the banks of estuarine rivers. They form dense thickets of prop roots and aerial stems, which in turn trap sediments and move the shallow mud flats and delta areas seaward. The mud, stems, and roots make excursions into mangroves difficult, a real biological adventure.

Mangroves are highly productive areas contributing to the food chains of coastal oceanic areas. The biomass and diversity of invertebrates per unit area of mangroves and adjacent mud flats is very high. Seabirds using mangroves as rookeries and by depositing their guano, they return valuable nitrogen from the oceans to the mangrove forest. Many oceanic organisms rely on mangroves for part of their life cycle, so mangroves are nurseries for ocean fisheries. The thick mangrove forests also protect low coastal areas in storms. However, humans have tended to look upon mangrove swamps as useless vegetation blocking their access to the coast, so mangroves have been destroyed in many areas by human development. Given the key position mangrove forests in the life cycles and food chains of coastal oceans, this destruction will have an adverse affect on coastal fisheries.

Importance of Mangrove

1. Mangroves protect shorelines from damaging storm and hurricane winds, waves, and floods. Mangroves also help prevent erosion by stabilizing sediments with their tangled root systems. They maintain water quality and clarity, filtering pollutants and trapping sediments originating from land.

2. Serving as valuable nursery areas for shrimp, crustaceans, molluscs, and fishes, mangroves are a critical component of Florida's commercial and recreational fishing industries. These habitats provide a rich source of food while also offering refuge from predation. Snook *(Centropomus undecimalis),* gray snapper *(Lutjanus griseus),* tarpon *(Megalops atlanticus),*

jack *(Caranx spp.)*, sheepshead *(Archosargus probatocephalus)*, and red drum *(Sciaenops ocettatus)* all feed in the mangroves. Florida's fisheries would suffer a dramatic decline without access to healthy mangrove habitats.

3. In other parts of the world, people have utilized mangrove trees as a renewable resource. Harvested for durable, water-resistant wood, mangroves have been used in building houses, boats, pilings, and furniture. The wood of the black mangrove and buttonwood trees has also been utilized in the production of charcoal. Tannins and other dyes are extracted from mangrove bark. Leaves have been used in tea, medicine, livestock feed, and as a substitute for tobacco for smoking. In Florida, beekeepers have set up their hives close to mangroves in order to use the nectar in honey production.

A wildcat haven and covered almost entirely in dense jungle and mangroves, exploring it requires some alternative transport. Thanks to the maze of narrow waterways that crisscross the land, kayaking is a popular choice for anyone wishing to venture deeper into the jungle. And, paddling your way through these dense mangroves offers a chance to see the natural wonders of an island.

> **"We need to think of 'blue carbon' and other services provided by healthy marine ecosystem. Mangroves, seagrasses and coastal marshes are great sinks of the atmospheric carbon".**
>
> **— Enric Sala**

Sachin Tendulkar

Arijit Mitra
B.A., 1st Year
Bengali Honours

One of the greatest cricketer & our legend Sachin Tendulkar was born in Bombay on 24th April 1973. His father's name is Ramesh Tendulkar. He has three siblings Ajit, Nitin & Sabita.

Sachin is a former Indian Cricketer and a former Captain regarded as one of the greatest batsmen of all time. The highest run scorer of all time in International Cricket, Tendulkar took up cricket at the age of eleven made his test debut on 15th November 1989 against Pakistan in Karachi at the age of sixteen and went on to represent Mumbai domestically and India internationally for close to twenty four years. He is the only player to have scored one hundred international centuries. The first batsman to score a double century in a one day international the holder of record for the most number of runs in both ODI and Test Cricket & the only player to complete more then 30000 runs in International Cricket and to be a part of 6 World Cups (1992-2011) in his carrer, Tendulkar was a part of the Indian team that won the 2011 World Cup, his first win in six World Cup appearences for India. He had previously been named 'Player of the Series' (Most runs 673) in the 2003 edition of the Tournament.

Tendulkar received Arjuna Award in 1994 for his outstanding sports. In 1997 he received Rajiv Gandhi Khel Ratna for India's highest sporting achievement and he also received 'Padmashri' & 'Padmavibhusan' awards in 1999 and 2008 respectively. India's fourth & 'second highest Civilian Award'. After a few hours of his final match on 16th November 2013 the Prime Minister's Office announced the decision to award him the 'Bharat Ratna' India's highest civilian award. He is the youngest recipient to date and the first ever sportsman to receive the award. On 4th June 2012 Tendulkar was nominated to Rajya Sabha the upper house of Parliament of India. He is the 1st Person awarded the honorary rank of group captain by the Indian Air Force. He is the God of Cricket. His nickname is 'Master Blaster'.

In December 2012 Tendulkar announced his retirement from ODIs. He retired from 20-20 Cricket in October 2013. And subsequently he retired from all forms of cricket on 16th November 2013 after playing his 200th Test Match against West Indies in Mumbai's Wankhede stadium. Tendulkar played 663 International Cricket matches in total scoring 34347 runs.

'Sachin Tendulkar The God of Cricket'

'Master Blaster'

Child Labour

Sreyasi Mondal
B.Sc., 2nd Year
Botany Honours

Can we eliminate child labour ? Though this is desirable but its root actually lies in the socioeconomic scenario that is prevalent in our country. It's actually impossible to evict child labour from our society. Anyone just can't ignore the fact that employers pay much less to a child than they would pay to an adult through work in quite same and equally deserving. It is a nightmarish situation for the young children as they're not even privileged with basic education.

But when one considers the economic compulsions of the families which force the children to work, it is seen that elimination of the child labour is a distant dream unless the socioeconomic status of this below poverty level families is improved.

Realising the harm child labour might cause, the Indian Government took few steps to stop exploitation and improve their working conditions. Besides a comprehensive law called Child Labour Act 1986 was promulgated to prohibit employment of children in some hazardous occupation and process.

In India 1987 Indian Government formulated national policy on child labour to protect the interests of children and focus on development programmes for the benefit of child labourers. As a part of the policy, National Child Labour Projects had been set up in different part of the country to rehabilitate child labour. Under this project special schools are established to provide non-formal education, vocational training, supplementary nutrition etc. to children who are withdrawn from employment.

Though elimination of child labour is an impossible task in current scenario, the Indian government is putting up a fight against it, making sure to increase the literacy among children, giving them a healthy lifestyle. But the million dollar question is, when will the ideal situation for these children come ?

> "Child labor means poverty, unemployment, illiteracy, population growth, and other social problems."
>
> — Kailash Satyarthi *(Nobel Prize winner in peace.)*

ডুয়ার্সের টানে

ড. শাশ্বতী চ্যাটার্জী
অধ্যাপিকা
রসায়ন বিভাগ

ডুয়ার্সে যাচ্ছি শুনলেই কিছু পরিচিত মানুষ বিস্ময়ভরা একটি প্রশ্ন করে বসে, 'আবার ডুয়ার্স?' বোঝাবার চেষ্টা না করে ছোট্টো কথায় উত্তর সারি, 'ভালো লাগে রে'। সত্যি তো, এখানে নেই বরফমোড়া পাহাড়, গভীর গিরিখাতে বয়ে চলা নদীর পাশ দিয়ে চলার শিরশিরনি,নেই গর্জনমুখর সুউচ্চ ঝর্ণাধারা। ডুয়ার্স সেজে আছে এক মায়াবী সবুজে — কোথাও বা হরেক গাছগাছালি, লতাগুল্ম, কোথাও বা যতদূর চোখ যায় সুবজে-সবুজে চাবাগান। এরই মধ্যে ছড়িয়ে আছে টিনের চালা নিয়ে ঘরগৃহস্থালি। আর আছে পাহাড়ের হাতছানি। ডুয়ার্সের এখানে-ওখানে পাহাড়ের ডাক শোনা যায় — শুধু সাড়া দেওয়ার অপেক্ষা।

আমাদের এবারের বেড়ানোয় কিছুটা ডুয়ার্সের সাথে জুড়ে নিয়েছিলাম অপেক্ষাকৃত নিম্নহিমালয়ের দু-একটি জায়গা। আমাদের সংক্ষিপ্ত গন্তব্য সূচিটি ছিল — সুনতালেখোলা, চাপড়ামারি, মূর্তি (দুদিন), গরুমারা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প, লেপচাজগৎ ও সুনাখারি (তাবাকোশি)। মূর্তি বাদে সব জায়গাতেই একটি করে রাত কাটানো। সংক্ষিপ্ত বলার কারণ গন্তব্যের পথে ও দুই গন্তব্যের মাঝে কিছু নজরকাড়া জায়গার কথা বলব। তেরোই মে কলকাতা ছেড়ে বাইশে ফিরে আসা নিজের শহরে।

আমাদের মতো যারা বেড়াতে ভালোবাসেন তারা জানেন কিছু ট্রেনের নাম উচ্চারণের সাথেসাথে কিছু জায়গার ছবি মনের মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করে; যেমন 'দুন এক্সপ্রেস' আমাদের মনকে পৌঁছে দেয় হরিদ্বারের গঙ্গার পারে। 'দিল্লি-কালকা মেল' নিয়ে চলে সিমলা পাহাড়ের ম্যালে। তেমনি, কে অস্বীকার করবে 'দার্জিলিং মেল' আমাদের ভাবনাকে নিয়ে ফেলে পাহাড়ের রানি দার্জিলিং ও তার আশেপাশে। যেখানে হেথায়-সেথায় সুদূর দিগন্তে জেগে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘার ইশারা। এহেন 'দার্জিলিং মেলে' চেপে বসেছিলাম ১৩-ই মে, ২০১৮।

প্রথম দিন (সুনতালেখোলা) ঃ— প্রায় দু-ঘন্টা দেরি করে ট্রেন এসে থামল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। বাইরে তখন বৃষ্টি অঝোরধারায়। ছাতা মাথায় স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে ফোনে ডেকে খানিক ভিজে মালপত্র গাড়ির মাথায় তুলে বেড়িয়ে পড়ি। পেটে খিদে, তবু স্টেশন চত্বরের দোকানে ঢুকি না। একটু প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে বসে টিফিন করার ইচ্ছে নিয়ে গাড়ি ছোটাই। মন্দের ভালো এক দোকানে টিফিন করিয়ে ড্রাইভার গাড়িকে ভুরিভোজ করিয়ে গাড়ি ছাড়ে। দুপাশে ঘন বনের মাঝ দিয়ে চলার পথটি সবুজ বনানী থেকে চোখ ফেরাতে দেয় না। আমবাড়ি রোড ছাড়িয়ে প্রশস্ত তিস্তা খালের ওপর ব্রিজ পেড়িয়ে এগিয়ে চলি। এসে পড়ে অপূর্ব সুন্দর গজলডোবা, তিস্তা ব্যারেজ। কোনো সাধারণ ভ্রমণার্থীর এখানে না-থেমে, ফটো না-তুলে নিস্তার নেই। কিছুটা বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গে কেন এত তিস্তাতিস্তা ডাক। নিউমাল, চালসা ছাড়িয়ে গাড়ি বাঁক নিল সামসিং, সুনতালেখোলার পথে। যেমন আচমকাই শুরু হয়ে গেল বনানী আচ্ছাদিত এক অপরূপ রূপের দেশ।

২-টোয় পৌঁছেগেলাম সুনতালেখোলা। নেপালি ভাষায় কমলালেবুর নামে নাম এই সুন্দরী খোলাটির। হারের মতো জড়িয়ে আছে যেন বনবিভাগের আবাসটিকে। 'খোলা' অর্থাৎ ছোটো নদীটির ওপর এক সাঁকো, পার হয়ে তৈরি করেছে আমাদের প্রবেশদ্বার। শরীর-মনে কোথা থেকে যেন পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার এক আবেশ ছড়িয়ে পড়ল। এজন্যই বারেবারে প্রকৃতির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে ছুটে আসা। এখানে আমার আর প্রকৃতির মাঝে কোনো বেড়া নেই। পাখির ডাকে এখানকার নৈ:শব্দ্য নিজের অস্তিত্ব যেন নতুন ভাষায় চিনিয়ে দেয়। হঠাৎ আচ্ছন্নতা কাটে খাওয়ার ডাকে। গণেশ নামের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন একজনকে ফোন করে বলা ছিল আমাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করে রাখার। তাকে স্বচক্ষে দেখতে না পেলেও তার নির্দেশের ওজন দেখেছি। কোনো একটি লেখায় ভদ্রলোকের নাম ও ফোন নম্বর পেয়েছিলাম। সারাদিন এদিক-ওদিকের লতা-পাতা, পাথরের ওপর হাঁটাহাঁটি করে অন্ধকার নামার আগেই যে যার কটেজে ঢুকে পড়ি। নৈশাহার সেরে শুয়ে শুয়ে ভাবি কালকের ছবির কথা!

দ্বিতীয় দিন (চাপড়ামারি) ঃ— আজ রাতের আস্তানা হবে চাপড়ামারি ওয়াইল্ডারনেস ক্যাম্প; পান্‌ঝোরা। বনবিভাগের লজটি ছাড়িয়ে হাল্কা বনের মাঝে ১/২ কিমি দূরে মূর্তি নদীর ধারে সাজানো গোছানো ৫টি কটেজ। নদীর পরেই সমান্তরালে চলেছে নিউমাল-আলিপুরদুয়ারের ট্রেনপথ। এরপর হাইওয়ে। আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকা বনবিভাগের বাংলোর চারপাশের গা-ছম্‌ছমে্ পরিমন্ডল এখানে পুরোপুরিই অনুপস্থিত। আমার মেয়ের আবার একটু পরিপাটি ব্যবস্থার প্রতি টান। ফলে আমি স্বপ্নভঙ্গের বেদনা পেলেও মেয়ে খুশি।

এখানে আসার পথে, কিলোমিটার তিনেকের মধ্যেই পেয়েছি রকি আইল্যান্ড। বিরাট বিরাট পাথরের বুকে পথ করে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে পাহাড়ি ঝোরা; গতি তার কুমারী বন, ন্যাওড়া ভ্যালি অভিমুখে। সুনতালেখোলা এক অর্থে ন্যাওড়া ভ্যালির একদিককার প্রবেশদ্বার। এপথের বিখ্যাত সামসিং ভিউ পয়েন্ট দেখে দৃষ্টিনন্দন পথশোভা দেখতে দেখতে চালসা মোড় এসে পড়ি। এখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে বিভিন্ন পথ গিয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন ঠিকানায়। আমাদের ঠিকানা ছিল চাপড়ামারি। ৩১নং জাতীয় সড়ক থেকে বাঁক নেওয়া জঙ্গলপথে। প্রবেশদ্বারের অফিসে নাম নথিভুক্ত করে পৌঁছে যাই পানঝোরা। এখানে ঘর ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল দুটো টিফিন ও লাঞ্চ ডিনারের খরচ।

টিফিন ও লাঞ্চ সেরে আমরা পৌঁছে যাই বনবাংলো সংলগ্ন ওয়াচ টাওয়ারে, যার সামনেই রয়েছে পিপাসার্ত বন্যজন্তুদের জল খাওয়ার মতো এক প্রশস্ত অগভীর জলাশয়। তারপরেই ঘন বন। দেখেই মনে হয়, হ্যাঁ, এই হল বন্যপ্রাণীদের বাস করার উপযুক্ত নিবাস। এক লহমায় মস্তিষ্কের নির্দেশে চোখ স্থির হয়ে যায় বনের গায়ে। যেখানে মনে হয় তাদের আসা-যাওয়ার দু-একটি অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁক হয়ে যাওয়া গলিপথ দেখা যাচ্ছে। অখন্ড মনোযোগে দেখতে থাকি। এক-এক করে জলার ধারে এসে জোটে একপাল বাইসন। অনন্ত খিদে নিয়ে অবিরাম ঘাসে মুখ দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তারা চলেছে। এক ফাঁক থেকে বেরিয়ে পাশের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েকটি হরিণ। ডুয়ার্সে ময়ূর খুব সহজলভ্য। এখানেও ঘুড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটি ময়ূরী। বাইসন, ময়ূরী ও দুটি বড়ো সারসের স্থির চিত্র দেখতে দেখতেই বনে এল বৃষ্টি। এক নিটোল ছবির পরিতৃপ্তি নিয়ে ফিরে এলাম পানঝোরার কটেজে।

তৃতীয় ও চতুর্থ দিন (মূর্তি) ঃ— আজ মূর্তি পৌঁছাবার আগে আমরা দেখে আসব ঝালং ও বিন্দু বলে সুন্দর দুটি প্রাকৃতিক জগৎ। এটা আমরা আগের দিন পানঝোরা আসার পথেও দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু তাহলে লাঞ্চটা আবার পকেটের কড়ি দিয়ে করতে হত। আবার ফিরে চলি চালসা মোড়। দোকানপাটে জমজমাট গঞ্জ। সেখান থেকে খুনিয়া মোড় হয়ে বাঁদিকে চলে গেছে ঝালংয়ের রাস্তা। অপূর্ব সুন্দর দু-ধার বনে মোড়া এক রাস্তা। রাস্তা যে এত শব্দহীন হতে পারে তা নিজে না এলে অনুভব করানো যাবে না। হাতিরা যখনতখন বেড়িয়ে পড়ে এরাস্তায়। এরপর আমাদের গাড়ি ছুট লাগাল এক ছিমছাম ফৌজিটাউনের রাস্তা ধরে। দুপাশে রঙিন ছোটো ছোটো বাড়ি। ভারী সুন্দর এ পথের স্মৃতি। গাড়ি এসে থামে জলঢাকা নদীর পার্শ্ববর্তী জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের পাশে। আগেই পেরিয়ে এসেছি জলঢাকা বনবাংলো। এখানেও নদীর পাশে ছবির মতো সাজানো একটি বাংলো। এনদীর পারও সবাইকে কাছে টেনে নিল। কিছুক্ষণ এখানে কাটিয়ে এগিয়ে চলা ভুটানসংলগ্ন ভারতের শেষ বিন্দু ‘বিন্দুর’ পথে। বিন্দুতে মিশেছে জলঢাকা ও বিন্দু নদী; এদের মিলিত প্রবাহ থেকেই জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে জলঢাকায়। বিন্দুর পাশ দিয়েই চলে গেছে ভুটানে যাওয়ার রাস্তা। আগে ভেতরে গিয়ে বহুধাবিভক্ত বিন্দু নদীটিকে দেখা যেত। এখন এপথ নিরাপত্তার বলয়ে বন্ধ। আমরাও ফিরে চলি মূর্তির পথে। ফেরার পথে জলঢাকার হাটটিতে ঘুরে আসি। বেশ লাগে, অন্য ধরনের মুখচোখের মানুষগুলির বাজার করা দেখা। বাজার সেরে গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা। লাঞ্চের আগেই ডব্লুবিটিডিসিএল-এর চৌহদ্দিতে চলে এল আমাদের ‘বোলেরো’। ড্রাইভার সাহেব পড়িমরি ছুট লাগাল পত্নী সন্দর্শনে। নিখুঁতভাবে সাজানো সবুজ লনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় তিরিশটি কটেজ — সিমেন্টের ও কাঠের মিলিয়ে। রাস্তা পার হলেই মূর্তি — সুন্দরী স্রোতস্বিনী। খাওয়া শেষেই বেরিয়ে পড়া মূর্তির পারে। নদী ছুঁয়েই উঠেছে বনবিভাগের লজ ‘বনানী’। যত্নে খামতি পড়েছে বোঝা যায়; তবে অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর। লজটিকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় উঠি, হেঁটে চলি নদীর ওপরের ব্রিজ পার হয়ে। এরাস্তাটি চলে গেছে আলিপুরদুয়ার — এমন বনের মাঝ দিয়ে চলতে ইচ্ছে করে খুব। কিন্তু এসব পথে মনের আশ মেটাতে পারে এমন ড্রাইভার পাওয়া কঠিন। সবাই চায় সবচেয়ে কম তেল পুড়িয়ে আপনাকে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছে দিতে। যা হোক, অন্ধকার গাঢ় হওয়ার আগেই কটেজে ফিরে আসি। রাতের খাওয়ার অর্ডার নিয়ে যায়। কটেজের কর্মচারীদের ব্যবহার এরই মধ্যে মন কেড়ে নিয়েছে।

এবার আমরা কোনো নামকরা জঙ্গল সাফারিতে যেতে আগ্রহী ছিলাম না। পরিবর্তে ক্রমশ পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসা মেদলাবাড়ি ফরেস্টের পথে বেড়িয়ে পড়ি লাঞ্চের পরে। এখানে শেষ এক কিমি পথ মোষের গাড়িতে যেতে হয়। এমন এক অনেকের কাছে হাস্যকর সাফারিই আমাদের আকর্ষণ করে। টিকিট কেটে মোষের গাড়িতে সওয়ার হয়ে পৌঁছে যাই ওয়াচ টাওয়ারে। জঙ্গলে চোখ বসতে না বসতেই চারটে গন্ডার দৃষ্টির সীমায় এসে পড়ে। সবচেয়ে সুখের কথা তাদের গতি ছিল আমাদের অভিমুখেই। ফলে, স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল তাদের বিশাল অবয়ব। এআনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল এদের খানিক দূরেই দুই হাতির গজেন্দ্রগমন। গরুমারা ওয়াচ টাওয়ারে বসেও গন্ডার দেখেছি, কিন্তু তার অবস্থান ছিল তুলনায় বহু দূরে। ভাবছিলাম, গাড়িতে বসে যারা হাসাহাসি করছিল তারা এখন কি বলে! ফেরার পথে রাস্তার পাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুটি ময়ূর ষোলোকলা পূর্ণ করে। এখানকার বনবাংলোটিও নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেজে আছে। আমাদের গাড়ি ফেরে। এখানে

সব জায়গাতেই গ্রামীণ শিল্পীদের উৎসাহ দিতে লোকগান, লোকনৃত্য ইত্যাদির আয়োজন হয়। জঙ্গলে বেড়াতে-আসা মানুষেরা কোনো প্রত্যক্ষ দক্ষিণা ছাড়াই সে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন, চাইলে অংশ নিয়ে গ্রামীণ কলাকুশলীদের উৎসাহও দিতে পারেন। লাটাগুড়ি, গরুমারা পার হয়ে একটু চা খেতে থামি। ছোটো এক গঞ্জ মূর্তির খুব কাছেই। আমাদের ড্রাইভার ওসমান বাবু এর পাশের গ্রামেই থাকেন শুনলাম। পৌঁছে যাই নিজেদের নৈশ আবাসে। কাল আমাদের দলের একটি অংশ ফিরে যাবে নিউ জলপাইগুড়ি; আমরা তিনজন নেমে যাব গরুমারা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে যা 'গাছবাড়ি' নামেও পরিচিত।

পঞ্চম দিন (এলিফ্যান্ট ক্যাম্প) ঃ— সকালের টিফিন সেরে আমরা সাতজন বেড়িয়ে পড়ি মূর্তির মায়া ছেড়ে। ১১-টা নাগাদ পৌঁছে যাই গন্তব্যে। চাবাগানের মধ্যে বড়ো সুন্দর এক নিরালা আশ্রয়। পাশেই সুতলি থেকে থান বুনে ব্যাগ, পাপোশ, কার্পেট ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে স্থানীয় মহিলাদের হাতে। পাশাপাশি গ্রামেই এরা থাকেন। সবটা মিলিয়ে একটা পরিবারপরিবার ভাব। খাওয়ার হোটেলটিও চলে স্থানীয় মহিলাদের রান্নাবান্না ও ছেলেদের করা বাজারে। এতটা দূরে এতটা শৃঙ্খলা মেনে সব হচ্ছে দেখতে ভালো লাগে। গল্পের মধ্যে যতটা পারছি জানাচ্ছি এসব কথাই। আমাদের খানিকটা ভারাক্রান্ত করে আমার মেয়ের সহপাঠিনীর পরিবারটি নিউ জলপাইগুড়ির পথে এগিয়ে যায়। আমরা এগিয়ে যাই প্রায় ১২ ফুট উচুতে, গাছের সঙ্গে গেঁথে রাখা আমাদের 'গাছবাড়ি'র দিকে। ভেতরে সুন্দর ব্যবস্থাপনা।

দুপুরে সামান্য দূরে বয়ে চলা মূর্তি নদীতে ক্যাম্পের হাতিগুলিকে স্নান করানো হয়। আমাদের ডাক পড়ল। ভারী মজার সে দৃশ্য! মাহুতেরা একে-একে যে যার হাতিকে হাঁটুজল নদীতে নামাল। অতি বাধ্যের মতো মাহুতের নির্দেশ অনুযায়ী আগে-পিছে ডাইনে-বামে করে কাত হয়ে জলে শুয়ে পড়ল সটান। ওরা পাথর দিয়ে ঘষেঘষে তাদের গা পরিষ্কার করা শুরু করল। আমাদেরও হাত লাগাতে বাধা নেই। বেশিক্ষণ এ দৃশ্য উপভোগের সুযোগ পেলাম না, আকাশভাঙা বৃষ্টির জন্য। দৌড়ে যে যার মতো ওয়াচ টাওয়ারে আশ্রয় নিতেনিতেই আধভেজা। বৃষ্টি ধরতেই সরাসরি এসে বসা খাওয়ার টেবিলে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ ডাক, হাতি সাফারিতে যাওয়ার জন্য। বেড়িয়ে পড়ে হাতির পিঠে চেপে বসি। দুলকি চালে মূর্তি নদী পার হয়ে হাতি ঢুকে পড়ল সামনের জঙ্গলে। কিছুটা যেতেই কাছাকাছি দেখা পেলাম দুই গন্ডারের, অনেকগুলি ময়ূরের। তবে হাতির পিঠে চেপে, তার গাছপালা সরিয়ে সরিয়ে এগিয়ে চলার মজাটাই আলাদা। জন্তুজানোয়ার দেখার চেয়ে ওই বুঝি কিছু দেখা যাচ্ছে — ভাবনাতেই আমার আনন্দ। সত্যি দেখা গেলে ভালো, অদেখা থাকলেও কোন খেদ থাকে না। লজে ফিরে দেখি সেই লোকঅনুষ্ঠানের আয়োজন সম্পূর্ণ। আমরা বসতেই শুরু হয়ে গেল। কলকাতার এক শিক্ষিকা ওদের নাচে সামিল হয়েছেন। এ জায়গায় উনি আগেও ক'বার এসেছেন। অনুষ্ঠান শেষে নৈশাহার সেরে লজে। কালকের গোছগাছ মিটিয়ে চাবাগানের নৈ:শব্দ্যের মাঝে ঘুমিয়ে পড়া।

ষষ্ঠদিন (লেপচাজগৎ - ৭০০০ ফিট) ঃ— আজ আমরা ডুয়ার্স ছেড়ে হিমালয়ের কোলে ছোটো জনপদ লেপচাজগতে চলে যাব। আজ ছোটো বোলেরো নিয়ে হাজির নতুন পাইলট নূর ইসলাম। লজের দিদি ও দাদাদের বিদায় জানালাম। লজের পক্ষে তিন আবাসিককে তিনটে সুতলির পাপোশ উপহার দেওয়া হল। আমরা

বেশ খানিকটা রাস্তা পার হয়ে হাজির হলাম জাতীয় সড়কে। চালসা ছেড়ে গাড়ি ঘুরে গেল নিউমাল স্টেশনের দিকে। স্টেশনের বাঁদিকে নাকি বাংলাদেশে যাওয়ার ট্রেনলাইন। করোনেশন ব্রিজ পার হয়ে আমরা চলব কালিম্পং হয়ে। কী যে অপূর্ব এ পথটি! দুদিকে বিশাল বিশাল সরলবর্গীয় গাছের সারির মাঝে পথ। করোনেশন ব্রিজের দুপাশে মনভোলানো তিস্তা ব্যস্ত রাখে ছবি তুলিয়েদের।

একবুক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে এসে পৌঁছোলাম মংপুর সেই গৃহদ্বারে, যে গৃহ চার-চারবার রবীন্দ্রপরশে ধন্য হয়েছে সম্ভবত ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। শেষবারের জন্মদিনটি এখানেই পালিত হয়, রচিত হয় 'জন্মদিনে' কবিতাটি। ভবনটির নামকরণ হয় রবীন্দ্রভবন, পরবর্তীতে রূপান্তরিত হয় রবীন্দ্রমিউজিয়ামে। ভবনটির পরতেপরতে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ — তাঁর অঙ্কিত চিত্রমালায়। মুক্তাক্ষরে রচিত সাহিত্যে, ব্যবহৃত খাটে ও টেবিলে। মায় ব্যবহৃত হোমিয়োওষুধের ছোটো ছোটো শিশিতে। পরম মমতায় স্থানীয় এক পঞ্চাশোর্ধ্ব নেপালি ভদ্রলোক শিশির রাউথ সব আগলে রেখেছেন। নির্দ্বিধায় নিজের পরিচয়ে বলেন কেয়ারটেকার। ভাবি, পোশাকি এক কিউরেটর এর বেশি কী করতেন! আদতে বাড়িটি ছিল রবীন্দ্রশিষ্যা মৈত্রেয়ি দেবীর স্বামী কুইনাইন বিশেষজ্ঞ মনমোহন সেনের সরকারি আবাস। শিষ্যার টানে ও হিমালয়ের সিঙ্কোনা গাছের নিভৃতে শান্তির পরশ পেতে এখানে ছুটে আসতেন কবি। শিশিরবাবু জানান, শেষ ১২ মাইল রাস্তা যখন মোটরযোগ্য ছিল না তখন তাঁর ঠাকুরদার পালকিতে কবি এখানে এসে পৌঁছান। অবিরাম জলদগম্ভীর স্বরে 'সেই ভালো সেই ভালো....' গানের দুকলি গেয়ে চলা রবীন্দ্রসেবককে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাত্রা করি আজকের গন্তব্যের পথে।

হিমালয়ের পরিচিত পাকদণ্ডী পথ ধরেই চলছিলাম — এবার আরও ওপরে ওঠা। দুপাশে সুউচ্চ সরলবর্গীয় গাছের বন। কোথাও বা একদিকে বাড়িঘর। প্রায় দুপুর গড়িয়ে এসে পৌঁছাই 'লেপচাজগৎ'। চলমান লোকজনের নির্দেশমতো গাড়ি এসে থামে লজের সামনে। বাইরে থেকে মোটেই মন টানে না। ভেতরে গিয়ে নাম লেখার পাট শেষে একজন মালপত্র নিয়ে ঘরে পৌঁছে দেয়। ঘর ও পরিপাটি বিছানা দেখে মন ঘুরে যায় ১৮০ ডিগ্রি। মনে হল এঘরে বেশ কদিন থাকলেও খারাপ লাগবে না। ঘরের জানলা দিয়েই দেখা যাচ্ছে কাছে দূরের সবুজ বনানী। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এ জানলা দিয়েই দেখা যাবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এরপরেও কোন্ হিমালয়প্রেমিকের মন খারাপ থাকতে পারে? ঘড়িতে তখন ৩.৩০ মি.। মুখ কাচুমাচু করে লজ দেখাশোনার মেয়েটিকে শুধাই, একটু ডাল-ভাত-আলুভাজা হবে কি? সে তার থেকেও উঁচু পোস্টের কাউকে জিজ্ঞেস করে জানাল 'হবে, আধঘন্টা সময় লাগবে'। একঘন্টা মঞ্জুর করে বিছানায়। ডাক পেয়ে খাওয়ার টেবিলে। এত কম সময়ে এত সুন্দর সাজিয়ে যে খাবার পরিবেশন করা যায়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যত্ন, মমত্ব ও রুচির এক স্নিগ্ধ বিন্যাস। জানলাম, শাশুড়ি-বৌমার হাতে লজটির যাবতীয় কাজ চলে। নিঃশব্দে যে যার দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। রাতে শোওয়ার আগে বলে গেল ভোরে জানলায় চোখ রাখতে। এসব কথায় আমার ঘুম গাঢ় হয় না। চোখ একবার জানলায় একবার ঘড়িতে। হঠাৎ, ভোরের আলো ফুটেছে কি ফোটেনি জানলা আলো করে দাঁড়িয়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা! যেন আমারই জন্য। পাহাড়ে এসে ভোঁসভোঁস করে ঘুমানো আমার খুব অপছন্দ। ঠেলে তুলি দুজনকে — ওদেরও চোখ স্থির হয়ে গেছে জানলায়। কাচের শার্সি খুলে দিই। বিভোর হয়ে থাকি ঘন্টাখানেক।

এবার চা খেয়ে বাইরে আসা। এখনও দিগন্ত জুড়ে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি। পায়েপায়ে এগিয়ে চলি ভিউ পয়েন্টের দিকে। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ওপরে। লেপচাজগৎ ছোটো এক গঞ্জ, এখনও অরণ্য প্রকৃতিকে ছাপিয়ে ওঠেনি। ফিরে আসি লজে, হিমালয়ে শেষ রাত কাটানোর প্রস্তুতিতে। স্নান সেরে টিফিন - আলুরপরোটায়। হিসেব মিটিয়ে বাড়তি পঞ্চাশটি টাকা দিতে বউটি বিস্মিত — কীসের টাকা! বুঝলাম এতে ও অভ্যস্ত নয়। বললাম, তোমার মেয়েকে একটা খেলনা কিনে দিও। এক দিব্য হাসিতে ভরে ওঠা বউটির মুখ দেখে আজকের যাত্রা শুরু হয়।

সপ্তম দিন (সুনাখাড়ি) ঃ— মিরিক লেক থেকে ৬-কিমি দূরে এক ছোটো জনপদ সুনাখাড়ি। চারপাশে চাবাগান। আবাসটির পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে রঙ্গভঙ্গ নদী। অল্পই দূর লেপচাজগৎ থেকে। এক নেপালি ভদ্রলোকের মানসকন্যা এটি বড়ো যত্নে সাজিয়েছিল; সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এক শিল্পী মনের পরশ। বৃষ্টির মধ্যে হাজির হলাম। শেষ দু-কিমি রাস্তাটি বড়ো ভঙ্গুর। বড়ো ছিমছাম এর পরিবেশটি। বিকেলে নদীর ওপর ব্রিজটি পেরিয়ে ওপারে; আছে মন্দির, গোম্ফা, খেলার মাঠ। খেলা উপলক্ষ্যে জিপ বোঝাই হয়ে এবং পায়েপায়ে দর্শক আসছে। এদের মাঝেই মিশে আছে খেলোয়াড়রাও। কিন্তু আমরা ফিরে চলি আমাদের আস্তানায়। রাতে দেখলাম বারবিকিউয়ের এক আসর চলছে। পাহাড়ের নৈঃশব্দ্য এখানে অক্ষত। মন একটু ভার। কাল ফেরা। কিন্তু মেয়ে খুশি। ফেরার পথে বাড়তি পয়সায় আমরা দার্জিলিং যাব। দেখা হবে ঘুম, ম্যাল, টয়ট্রেন, বাতাসিয়া লুপ এবং সর্বোপরি গ্নানারিতে বসে হট চকোলেট। কিছুটা সময় কাটাই পশুপতি মার্কেটে ইতস্তত ঘুরে। এরপর চাকা দার্জিলিংয়ের পথে। গাড়ি রেখে, ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে আমরা ম্যালের পথে এগোই। ঝকঝকে হয়ে উঠলেও ম্যাল যেন আজও সেই ম্যালটি। কী এক স্মৃতিজাগানিয়া স্থান! এসে বসি আদি অকৃত্রিম গ্নানারির চেয়ারে। কাচের জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিই বাহির পথে। এসে পড়ে এক মগ গরম চকোলেট। খাওয়া শেষ করে ড্রাইভারকে ডাকা ও নিউ জলপাইগুড়ির পথে বেড়িয়ে পড়া। কার্শিয়াংয়ের গাড়ি ও বাজারের ভিড় ঠেলে নিউ জলপাইগুড়ির গেটে আমাদের গাড়ি পৌঁছায় পৌনে ছ'টায়। আমাদের গাড়ির মূল ফড়ে বাপ্পা বা জয়ন্ত ঘোষ তার পাওনা আদায় করে। ড্রাইভার নূর ইসলামও বসে থাকে না। কথার নড়চড়ে কোথায় বেশি চলতে হয়েছে তার পয়সা আদায় করে। এত ভালো এক ভ্রমণের আনন্দ এদের কোনো আচরণেই মাটি হতে দেব না ঠিক করে নিয়েছিলাম। তাই কোনো ক্ষতির কথাই মনে ঠাঁই পায়নি।

চুপি চুপি জানিয়ে রাখি, আবার কিন্তু ডুয়ার্স হয়ে হিমালয়ে যাব।।

> ''কোন স্থানে এক নাগাড়ে থাকিবার ফলে মানুষের চিত্ত বিকৃত হয়। মন একটু ছুটি চায়। আবহাওয়াকে পরিবর্তিত করিয়া লইতে চায়। তখন ভ্রমণ ছাড়া আর কিছুকে স্মরণীয় বলিয়া বোধ হয় না।''
>
> — ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

Fascinating Greece: A land of Myths and Modernity

Dr. Neela Sarkar
Associate Professor
Dept. of English

Sometimes life has this amazing quality of handing out surprises. Last October I was meeting Prof. Sukla Basu, Former Prof. of the Department of English and Modern European Languages, Visva Bharati , for our customary Bijoya get together, when over a cup of Darjeeling tea she said that the theatre group 'Poesis' of which she was founder had been invited to Greece to perform a play and whether I would be interested in going? For students of literature, Greece has a special fascination. I immediately said "yes". Little did I guess that I would have to perform too! The last time I had acted on stage was during my college days but the thought of going to Greece was enough to drive away the niggling doubts that I had about my histrionic talents.

We were scheduled to perform at the University of Crete on 26 .5.2018. The play chosen was Aristophanes' *Lysistrata.* The interesting part was that it would be in Bangla with Greek subtitles. Lysistrata is an antiwar comedy, where the main character tries to get the warring city states to abandon warfare and embrace peace. Our research showed that Lysistrata had a great deal of similarity with Durga our own warrior Goddess whose ultimate intention was to ensure that the Gods and the demons stopped their eternal feuds. Hence, our *Lysistra* was to be an embodiment of Athena and Durga. While we got the dialogues and a couple of dances ready, the Greek students would prepare a couple of dances which would be incorporated in the play. In this age of video conferencing this wasn't difficult to arrange. Since most of the members of 'Poesis' are professionals and students scattered over the districts of West Bengal, rehearsals could be held only on weekends. In addition to rehearsals, travel arrangements had to be made, props readied, costumes stitched, gifts packed, and hundred other things to be taken care of, and all in very short time. At one point of time we began to doubt we would ever be ready.

23rd May. The big day had arrived. Our flight to Athens via Doha was to depart at 3.a.m. We assembled at the Netaji Subhas Chandra Airport at midnight. International departures require one to report 3 hours prior to departure for security checks. Somehow time flew and soon we were boarding our Air Qatar flight to Athens. The plane was a wide bodied Boeing and we settled into our seats. The flight took off and we left the twinkling lights of Kolkata far below. Soon the stewards and hostesses came around serving a choice of Indian and continental breakfasts. At 6.30 a.m. we were at Doha , ready to take a connecting

flight. At Doha the young Airline official who was overseeing transfers was a Bengali, and there is nothing that gladdens a Bengali more than to find a fellow Bengali in a foreign land. The young lady who checked our passports was also a Bengali! We boarded our plane for the final leg of the journey and were served another round of delicious breakfast before we landed at Athens at noon.

Athens airport is about half the size of Netaji Subhash. We quickly cleared customs and stepped out into dazzling sunlight for our first experience of the city. The roads are clean, no body honks, pedestrians are allowed to cross and vehicles wait patiently. The shops are neatly laid out, and the people are extremely friendly. Orange trees lined the streets and oranges were there for the picking! Our host, Iannis, a doctor, took us to his apartment where we were treated to a traditional Greek lunch comprising pita breads, souvalaki which is somewhat like our kathi rolls , dolma, a close cousin to the Bengali favourite, the '*paturi*' (stuffed vegetables baked in grape leaves.) tzatziki made of yogurt, remarkably like our raita, Greek salad and cheese and of course the ubiquitous wine. We have all heard about how good looking the Greeks are but no one had quite prepared us for their hospitality. They are amazingly gracious.

Our first visit was to the Acropolis, the chief attraction of Athens. The Acropolis is an ancient citadel on the highest hilltop but is badly damaged. The Parthenon, the temple dedicated to Goddess Athena the patron of Athens is also included in the same complex . One is awestruck by the sheer size and stark beauty of these temples which were built in the 6^{th} C BC. Although at first, climbing up the hillside seemed a daunting task, sheer excitement led us on and once at the top we were rewarded with a panoramic view of the city below. The port of Piraeus lay in the distance bathed in a golden glow. The sun was still high in the western sky when we came down around 8 pm. After walking around the Plaka which is the old historical district and the main shopping area we had our dinner at one of the quaint roadside cafes and retired for the night.

24^{th} May: The second day dawned bright and clear and after a quick breakfast we were off to the Temple of Zeus. The massive remnants of the temple were impressive no doubt, but like the Acropolis this too was in ruins. From here we went to watch the Changing of the Guards, at the tomb of the Unknown Soldier, in front of the Presidential Palace. Every day at 11a.m. this highly stylized ceremonious exercise is carried out. The uniforms of the tall and strapping soldiers are elaborate and remarkable; they have three sets of official uniforms with different historical significance to be worn on special days. The whole exercise had us totally enthralled. Suddenly dark rain clouds began blowing in from the sea and we were relieved to escape from the Mediterranean sun. From here we went to visit the theatre

of Epidaurus. This is the largest and the best preserved theatre in Greece. Built into the hillside it is remarkably well preserved. Built like an amphitheatre, the actors performed in the well, there was a place for the musicians and the chorus and the galleries could accommodate 5000 spectators. What was truly remarkable was that even without the use of microphones the actors were clearly audible. We tested this out by shouting from the stage to our friends who had gone up to the topmost tier of the gallery. The rain clouds which had been threatening for quite some time finally came down and we were caught in a deluge. The rain cleared just as suddenly as it had appeared and we had the heavens smiling down at us once again. With a clear blue sky and a crisp wind which smelt of the earth and the oleanders which lined the highway we were off to the harbor of Piraeus from where we would catch the cruise to Heraklion, the capital of the Greek island of Crete. From the cruise ship we were witness to a spectacular sunset, and when the ship finally left the harbour the twinkling lights reflected in the harbour reminded me of Ganga Arati on the Ghats of Benaras or Haridwar. We had just spent two fantastic days and our cup of joy was full to the brim. As we settled into our bunk beds for the night we couldn't have wished for anything more.

25th May: Arrived at Heraklion at 7a.m. and stepped out into bright sunshine. Wide empty streets with a few taxis and buses plying, greeted us much like a 'bandh day' in Kolkata. Iannis's father and aunt were waiting for us. They greeted us as if we had known each other for ever. We piled into the cars and in half an hour we were at their place. A sumptuous breakfast, comprising of cereals, doughnuts, bread, homemade jams, cheese, pancakes and honey, awaited us but what was really humbling was the icing on the cake which read 'apnake swagato' in Bangla script. I wonder whether any of us would go to such lengths to make our guests (whom we were meeting for the first time) feel so special. From breakfast it was straight to stage rehearsal at the University auditorium. Here the Greek students had prepared a couple of dances which were to be incorporated, plus some boys had roles as policemen and citizens. Since it was a play with which they were familiar we quickly ran through the play. The ease with which we were able to incorporate the sections which were to be performed by the Greek students brought home the point that language is no barrier when it comes to theatre.

Our next destination was the beach of Matala, a major tourist attraction. The drive up to Matala was breathtakingly beautiful with the mountains on one side and the sea on the other. The sea itself was a brilliant blue and many tourists were either swimming or sunbathing. We satisfied ourselves with wading into the sea and after an exotic seafood lunch we continued on our way to the village of Pefkos, our halt for the night and Iannis's country home. The beautiful house on top of the hill with olive groves, orange , peach and

cherry orchards and with a vineyard to boot, seemed to be a location for a film shoot. We couldn't have been more excited! However there were to be no end to surprises that day. Soon the neighbours trooped in with traditional Greek dishes and we all enjoyed a traditional Greek supper washed down with homemade wine under a starlit sky with some impromptu song and dance. It seemed I was watching a scene from Shakespeare's *As You Like It,* such was the level of enchantment. The next day was our performance so after dinner we diligently tried to rehearse but the days travelling and the sumptuous dinner soon got in the way of our noble intentions.

26th May: The Big day, our performance. No nonsense today. Breakfast followed by final rehearsal and then the two hour drive back to Heraklion. Luch at Iannis's place. Iannis who understands Bangla pretty well must have told his mother that some of us were literally dying for some plain simple rice. So imagine our delight when there was herb rice on the menu. However we did not have the luxury to spend much time over food today. There would be a Press Meet at 4 p.m. followed by the play. We were pleasantly surprised to find that the auditorium was full; we honestly had not expected so many people to turn out for the show. Happily our play was very well received. We were even featured in the evening telecast! With the headache of the performance over we were free to enjoy the night life in Heraklion. Some went to a pub, while some others preferred to walk by the seashore. It was a full moon night and the beauty of the moon blanched sea shore was magical.

27th May: Up early, to catch the ferry to Santorini. These ferries are miniature cruises, offering five star amenities. From specialty restaurants to luxurious rooms they have it all. This journey was to be a short one so we decided to go up on deck and enjoy the view. These islands are volcanic and the rocks and vegetation at the bottom impart an inky blue colour to the waters. We sailed past many small islands and finally spotted Santorini. Santorini is hard to miss with its iconic white cave houses built into the hillside. It has world famous vineyards and spectacular beaches. We first visited Santos Vines, a famous vineyard and saw how wines are prepared and bottled. The beautiful property half way up the hillside overlooks the sea and sitting at the café and sampling the wines was a novel experience indeed. Suddenly the place was teeming with people and we were witness to a Greek wedding. The groom and the bride exchanged rings, said their vows and were toasted by friends, family and onlookers. From here we went to the towns of Fira and Oia on the hill top . From Oia we witnessed a glorious sunset as the sun dipped into the Aegean Sea. Immediately the temperature dropped and cool breeze began to blow. The lights in the shops and houses came on one by one and it seemed we were in a land of fireflies. Just one day was definitely not enough to enjoy the beauty of this wonderful island.

28th May: Arrived at Athens after a 9 hour journey. Today we would visit Sounion. At Sounion, about 70kms from Athens, is the Temple of Poseidon, the Greek God of the Sea. Here the horizon meets the Aegean sea. I couldn't believe that I was actually standing there! Up on the hilltop it was windy and we happily clambered up the hillside resting occasionally to catch our breath. The sun took its own sweet time to rest and we had all the time in the world to capture the sights for posterity. The sun finally dipped into an inky blue ocean at about 8.30.and we proceeded to a nearby café for a seafood dinner. Needless to say it was interesting, comprising of squid, and lobster among others. After a supremely relaxed dinner we headed back to Athens under a canopy of stars. It was magical. When we reached Athens, the night was still young, the cafes were doing brisk business and people walked around leisurely or sat in groups chatting or listening to the street musicians. The Acropolis on the hilltop was brilliantly lit up and Goddess Athena looked down indulgently on the antics of the mortals below.

28th May: The Trip to Delphi. The extensive site covers the south western slope of Mount Parnassus. The pan –Helenic sanctuary of Delphi, where the oracle of Apollo spoke, was the site of the Omphalos, the 'navel of the world'. Legend has it that Zeus in order to locate the centre of the earth released two eagles from the opposite ends of the earth. They collided at Delphi and Zeus deduced that Delphi was the Omphalos. Steeped in myths Delphi is a major site for the worship of Apollo. By far the most important form of divination came from priestess of Apollo, Pythia. Apollo himself possessed the Pythia and spoke enigmatic prophecies directly through her, hence ensuring the sanctity, potency and authenticity of the oracle. Throughout the ancient classical world people consulted the oracle. On the way back from Delphi we took a detour through the ancient city of Thebes. I got goosebumps just imagining that I was actually at the crossroad where Oedipus had challenged his father! Although Thebes is now a modern city, history and myth have wrapped a magical veil over it ,transforming it into the stuff of dreams.

29th May: Our last day. We had had a wonderful trip and actually getting to see the places we had only read about had been an exhilarating and enriching experience. Greece is a beautiful country, steeped in history and culture, blessed with a balmy climate and beautiful and hospitable people. Greece consists of 1,400 islands so I do hope that I will go back again to this amazing country.

An Overview of the Cultural Activities of College (2017-2018)

Prof. Mauli Sanyal
Convener
Cultural Committee

Cultural activities are an integral part of New Alipore College curriculum and the year 2017- 18 was no exception to it. One of the most important events of the college, the **Annual Prize Distribution** was held on September 9th, 2017. It was an honour and privilege to have with us Swami Suparnananda Maharaj, Honorary Secretary, RKMIC, Kolkata, as the Chief Guest for this occasion. Dr. Pushpitaranjan Bhattacharya, Principal, Heritage College, graced the occasion as the Guest-of-Honour. Our students were truly fortunate to have received their awards for academic excellence from such dignitaries. Vanmohatsav was celebrated on the same day and the cultural committee was a part of it.

The sesquicentennial **birth anniversary of Sister Nivedita** was celebrated on October 28, 2017. The programme commenced with a rally by the students, teachers and staff around the college with posters and plackards of Sister Nivedita and her teachings. The NSS wing of the college played a prominent role in it. Dr. Chandan Chakraborty, Principal, Madhyamgram College, was the Chief Guest and Smt. Sanghamitra Ghosh, Principal, New Alipore Sri Sarada Ashram Uchha Balika Vidyalaya was present as the Guest-of-Honour. The two dignitaries delivered lectures on Sister Nivedita's philosophy of life. A documentary on Sister Nivedita, was also screened on this occasion. Smt. Ghosh presented the college with copies of books on the life of Sister Nivedita published by Sarada Mission which were distributed among the teachers and students of the college.

For the first time New Alipore College organized the Annual Cultural Festival cum Winter Carnival- '**Avensis**'. It was the brainchild of our Vice Principal, Prof. Dibes Bera and the Cultural Sub-Committee had the privilege to give it shape and turn the dream into reality. The three day programme held from 20th to 22nd December 2017, consisted of several events like Departmental Exhibitions, Music Workshop, Extempore, Debate, Painting and Drama Competitions. The College was fortunate to have renowned personalities like Prof. Amitava Gupta, retired teacher of the Department of English, Maulana Azad College, Smt. Jui Biswas, Councillor Ward no 81, KMC, Prof Avijit Majumdar, Department of Physics, IIEST and Prof. Satya Ranjan Bhattacharya of Saha Institute of Nuclear Physics as Guests of Honour and part of the jury for the departmental exhibitions. They were highly impressed with the works of our students. The students made tremendous efforts to showcase their knowledge and grasp over their respective subjects through their exhibits. Renowned Rabindra Sangeet

singer, Smt. Kamalinee Mukherjee, conducted a music workshop for the students. The responses from the students were overwhelming. The painting competition 'Battle of the Brushes' was held on the second day. Artist Smt. Rakhee Roy was the judge for the painting competition and the idea was to capture the beauty of the Winter Season. On the same day extempore and debate competitions were held and the students participated enthusiastically. The topic for debate was 'Social Media is a weapon in the hands of individuals'. Popular Radio Jockey, R.J. Roy of Radio One, judged the competitions. The third day was scheduled for the drama competition- 'Come Alive'. The event was co-ordinated and judged by famous theatre personality Smt. Urmimala Basu. We were mesmerised by the talents of our students. The three day long programme concluded with a cultural programme 'Wingding' by the students, the teachers and for the first time-the non-teaching staff. We were overwhelmed by the enthusiasm and active participation of the entire college, especially of the students in Avensis. The college wishes to extend the scope of Avensis to include more events and other colleges in the coming years.

Our students were encouraged to take part in competitions held outside the college premises like the **Zoo Festival** (14th- 18th November, 2017) at Alipore Zoo**, Chhatro-Yuva Utsav** (17th to 18th January 2018) organized by the Government of West Bengal and other **Inter College Competitions** in various colleges like Jogesh Chaudhuri College, Naba Ballygunge Mahavidyalaya and the like. In many of the events our students got awards for their performances.

The year 2018 started with **Swami Vivekananda's birth anniversary celebrations**. Prof. Gorachand Nag, HOD, Economics, delivered an enriching lecture on Swamiji. We were also entertained by songs and recitation of self composed poems by our students. The programme concluded with the screening of a documentary on the life of Swamiji prepared by Prof. Amartya Saha of the Department of Journalism.

Saraswati Puja, was celebrated in the college premises with humility and respect on 22nd January 2018, and the efforts of the Students Union of the college were commendable. Our college celebrated the colours of spring with '**Vasanta Utsav'**on the 6th of March, 2018. The programme commenced with a 'prabhat pheri' by the students, teachers and staff of the college with colours and flowers in hand. A small function was also held in the college grounds where the teachers and students performed songs and dance celebrating the youthful and colourful season. It was a humble effort of the cultural committee to introduce the students to the celebrations as propounded by Gurudev Rabindranath Tagore in Santiniketan. The teachers and students attired in yellow and red dresses gave a spectacular show.

The intra-college competition **Protishruti** was also held on this day. It was primarily organised by the Students Union of the college under the direct supervision of the Cultural Sub-Committee of the Teacher's Council. Students participated enthusiastically in the Quiz and Anatakshari competitions. The year ended with a sweet note. **Rabindra Jayanti** was held on 15th May, 2018. Students, teachers and the non-teaching staff payed homage to Kabi Guru Rabindranath Tagore through his songs, dances, poems and narratives.

The Cultural Committee is thankful to The President of the Governing Body and the MIC PWD, Sports & Youth Services, Govt. of West Bengal, Mr. Aroop Biswas, all the members of the Governing Body, Vice Principal, Prof. Dibes Bera, the Secretary of the Teachers Council, Prof. Gorachand Nag, Bursar, Prof. Gobindalal Mandal, all the teachers, non-teaching staff, the Students Union and above all the students, for the rich and varied cultural activities of the college.

A Report on the field work on the Santals of Susunia

Prof. Nabanita Goswamy
Dept. of Anthropology

Third year Hons. and General students of Anthropology Dept. went to Hapania Ramnathpur, Susunia for their ethnographic and pre historic field work from 12th November 2017 to 30th November 2017 at Susunia Youth Hostel. Prof. Nabanita Goswamy, Prof. Mandima Biswas, Prof. Monimekhala Dasgupta accompanied the students for pre historic field work they visited Gandheswari river bed for doing stratigraphy and excavation, and at Sahebpukur, Siulibona, Dhankura and Beraldanga stratigraphy and surface collection was made. For ethnographic field work, they collected data among the Santals on their different social institutions to have a 'thick description' of the people living in Ramnathpur Village.

Students were very excited about the field works and found it very interesting to collect qualitative and quantitative data, the different methodologies they applied to collect data and to cheer the theories learnt. In the begining they were very auxious whether they would be able to build rapport with them in order to collect data on the lives of the inhabitants. But later they found it is really very easy to approach the villagers and to work with them.

Through prehistoric field work students came to know about the different techniques.

New Alipore College Nature Club : The journey begins ......

Prof. Debarati Das
Secretary
New Alipore College Nature Club

The New Alipore College Nature Club started its journey officially on 12.12.2017. Our Nature Club is committed to sensitizing the members on issues relating to Environment. New Alipore College Nature Club encourages the members to be pro-active towards sustainable development in their given milieu. The members of New Alipore College Nature Club consists of the teachers, non teaching staff and students from various departments who are ready to do their bit for nature tirelessly. With more than fifty members, the Nature Club of New Alipore College embodies devotion to Mother Nature and Her creations. Such consciousness itself has carried us far beyond books to work for our theme of conserving biodiversity.

From campaigns to holding seminars for prevention of plastic pollution to collection of information and photographs of the environment, the Nature Club members of New Alipore College have done it all. This year we have visited the 'Flower show' organised by The Agrihorticulture Society of India on 10th February,2018, which provided a glimpse to the beauty of nature. Much knowledge were accumulated by the fascinated members of New Alipore College Nature Club of techniques for the beautification of the college campus and use of eco-friendly products. The Nature Club also conducted a seminar to commemorate 'National Science Day' on 28.02.2018. A photography competition in connection with the visit to the Flower show was held on the same day. Arko Sengupta, IInd year B.Sc. Botany (H) student received the first prize in the photography competition. The photography competition was preceded by a very interesting and enlightening talk by Dr. Rita Paul of Charuchandra College on mimicry.

We are proud that in 2018, India has been chosen as the global host by the United Nations Environment Programme (UNEP, now also known as UN Environment) to address environmental issues primarily focusing on 'Plastic Pollution'. Therefore, to celebrate the World Environment Day on 5th June, 2018, New Alipore College Nature Club organized a seminar cum film show and a free from plastic usage campaign to support the cause. The programme was inaugurated by our Vice Principal, Prof. Dibes Bera who always motivates and provides us with the necessary impetus to strive forward. Plans are underway to render proper recognition to the New Alipore College Nature Club as an initiative of New Alipore College. Our aim is to teach by example that a clean environment is a communal as well as individual duty and that we are the protectors of our environment. The members of New Alipore College Nature Club uphold this positive attitude of environmental consciousness which we hope will in the future ultimately bring forth recognition in the world outside. Thus, the one thing we can all agree on is that the Nature Club of New Alipore College has taken the first few steps towards leaving its footprints in the sands of time.

Celebration of National Mathematics Day : A Report

Prof. Rita Chaudhuri
Assistant Professor
Department of Mathematics

One day conference was organised by the Department of Mathematics, New Alipore College on the occasion of Ramanujan's 130th birthday on 22nd December, 2017 as National Mathematics Day. The Indian Mathematical genius Srinivasa Ramanujan was born on 22nd December, 1887 and died on 26th April, 1920. The Government of India decided to celebrate Ramanujan's birthday as the National Mathematics Day every year in recognition of his contribution to mathematics.

The conference started with a warm welcome note by Prof. Dibes Bera, Teacher-in-charge, New Alipore College, followed by inaugural speech by Prof. Kollol Paul, Department of Mathematics, Jadavpur University. Prof. Paul was elaborated the relevance and need of celebration of the day.

The first speaker of this conference was Dr .Parthasarathi Mukhopadhyay, Department of Mathematics, Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. His topic was 'Srinivasa Ramanujan Ek Mohajiban'. Dr. Mukhopadhyay presented elaborately the life and work of Ramanujan and his oratorical skill left audience spell bound. The second speaker of the conference was Prof. Sumitra Purkayastha, Applied Statistical unit, Indian Statistical Institute. The topic of the speaker was 'what is the number of distinct real root of cubic equation'. He delivered a wonderful and knowledgeable lecture on the topic. The celebration of National Mathematics Day ended by showing a movie 'The man who knew infinity' based on the life of Ramanujan to inspire the students.

The conference was a grand success with active participation of students of the College.

নিউ আলিপুর কলেজের বাংলা বিভাগ আয়োজিত আলোচনাসভা — একটি প্রতিবেদন

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারি চট্টোপাধ্যায়
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

বাংলা আধুনিক কবিতা নাকি দুর্বোধ্য! এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু কাকে বলে 'আধুনিক কবিতা'? সাম্প্রতিককালে লিখিত যে-কোনো কবিতাকেই কি আধুনিক কবিতা বলা যায়? অন্যদিকে, মধ্যযুগের কাব্য কি একেবারেই আধুনিকতার স্পর্শ-বর্জিত? ভারতচন্দ্র পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে প্রবেশ করল — এই ধারণা কতটা সত্য আর কতটা ইওরোসেন্ট্রিক হেজিমনিক নির্মাণ? কবিতাকে কেন্দ্র করে এবংবিধ প্রশ্ন জমে উঠেছিল অনেক। সে সবেরই উত্তর খোঁজার জন্য নিউ আলিপুর কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল একটি আলোচনাসভার। বিষয় : 'বাংলা কবিতায় আধুনিক উপাদান'। ২-রা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮। কলেজের উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের সামনে এইসব প্রশ্নের ওপর একটু একটু করে আলো ফেললেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা অঙ্কনা বেতাল।

শুরুতেই তিনি জানান, 'আধুনিক' আর 'সাম্প্রতিক' সমার্থক শব্দ নয়। রবীন্দ্রনাথের *আধুনিক কাব্য* প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপিকা বেতাল মনে করিয়ে দেন, ''নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় যাকে বলে আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'' রবীন্দ্রনাথের চেনা বক্তব্য থেকে শুরু করে আলোচনা ক্রমশ প্রাগাধুনিক সাহিত্যের আলো-আঁধারির অলিগলির পথে এগিয়ে যায়। সাহিত্যের ইতিহাস লেখকেরা অনেক সময় দাবি করে থাকেন, আধুনিকতা নাকি উনিশ শতকীয় তথাকথিত রেনেসাঁস-উত্তর কালের ঘটনা। ইংরেজ না এলে বাংলা সাহিত্য আধুনিক যুগে পদার্পণ করতে নাকি আরও অনেক বিলম্ব হত। ইওরোপীয় আলোকায়নের এই দাম্ভিক তত্ত্বের বিরোধিতা করেন তিনি। বাংলা সাহিত্যের আদি এং মধ্যযুগের বিবিধ সাহিত্যকর্ম থেকে উদাহরণ চয়ন করে করে বুঝিয়ে দেন, ইংরেজ আসার আগেও আধুনিকতার ধারণা আমাদের অচেনা ছিল না।

রেনেসাঁস-পূর্ববর্তী যুগের আধুনিকতাকে তিন-চারটি বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে চিনে নিতে চেয়েছেন অধ্যাপিকা অঙ্কনা বেতাল। নাগরিকতা, লোকায়ত চেতনা, নারীবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি। মধ্যযুগের রাজসভার কাব্যে যেমন নাগরিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অল্পবিস্তর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের পরিশীলিত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের কথা তো সর্বজনবিদিত। ভারতচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে জানিয়েছিলেন, নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না। এই

সচেতন পরিণতমনস্কতাই বোধহয় তাঁকে আধুনিক যুগের যথার্থ পূর্বসূরির ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ভারতচন্দ্র তবু অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের কবি হওয়ায়, তাঁর কাছে আধুনিকতা খানিক প্রত্যাশিতই। কিন্তু চর্যাগানে? অধ্যাপিকা বেতাল জানান, বাংলা সাহিত্যের সুদূরতম বিন্দুটিতেও আধুনিকতার স্পর্শ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। চর্যাগীতি মূলত সাধনসংগীত হলেও সেগুলি জীবন-বিবিক্ত নয়। শবর-ডোম সম্প্রদায়, প্রান্তিক মানুষজনের ছবি চর্যাগীতিতে বারবার ফিরে এসেছে। সরল জীবনের এইসব ছবি সাম্প্রতিককালের কবি এবং পাঠকদেরও আকর্ষণ করে। তাই বারবার তাঁরা অনুবাদ করেন চর্যাগানের। সংখ্যাগুরুর ধর্মব্যবস্থা বা রাজসভার হেজিমনিকে গুরুত্ব না দিয়ে লোকায়ত জীবনকে তন্নিষ্ঠ মনোযোগে চিত্রিত করা — এও তো একপ্রকার আধুনিক প্রতিস্পর্ধাই।

উনিশ কিংবা বিশ শতকীয় নারীবাদী দৃষ্টিকোণ নিশ্চয়ই মধ্যযুগের কাব্যে আশা করা যায় না। তবু অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নারীদের টুকরো কিছু ছবি মধ্যযুগের কাব্যে পাওয়া যায়। উচ্চবর্ণের নারীরা ছিলেন অবরোধবাসিনী। কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীদের ক্ষেত্রে সামাজিক অনুশাসন এত কঠোর ছিল না। ফুল্লরার মাংস বিক্রি, দইয়ের পসরা নিয়ে রাধার হাটে যাওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ বহু শতাব্দী পরের স্বাধীন আধুনিকাদের একঝলক পূর্বাভাস দিয়ে যায়। ধর্মনিরপেক্ষতা যদি আধুনিকতার অন্যতম অভিজ্ঞান হয়, মধ্যযুগের সাহিত্যে তা নিতান্ত অলভ্য নয়। গীতিকাগুলি প্রধানত ধর্মনিরপেক্ষ লোকায়ত জীবনের গল্প বলেছে। ইসলামি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিও ধর্মনির্ভর মঙ্গলকাব্য-পদাবলির যুগে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। সব মিলিয়ে মনে হয়, সাম্প্রতিকের সীমানা পেরিয়েও আধুনিকতার ইশারা বাংলা কাব্যের সুদূর অতীত পর্যন্ত প্রসারিত।

এইভাবে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে ইওরোপীয় আধুনিকতার সংজ্ঞাটি পুনর্নির্মাণ করে নেওয়ার পর আলোচনা এগোয় উনিশ-বিশ শতকের বাংলা কাব্যের পথ ধরে। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে সমসময় প্রতিফলিত। বিধবা-বিবাহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাঁর রক্ষণশীলতা সাহিত্য সমালোচকদের বিরক্তির কারণ হয়েছিল। যথাযথ আধুনিক মননের প্রতিনিধি না হলেও ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহাসিক চেতনা প্রশংসনীয়। তবে আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। ভারতচন্দ্রীয় অনুপ্রাস-যমকের অতিরিক্ত কোনো পথের সন্ধান ঈশ্বর গুপ্তের সাধ্যাতীত ছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্ত অবশ্য আঙ্গিক ও বিষয় উভয় দিক থেকেই বাংলা কবিতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। মধ্যযুগীয় দ্বিপঙ্‌ক্তিক অন্ত্যমিলের দায় আর রইল না। বিষয়গত দিক থেকেও মধুসূদনের রাবণ চরিত্র বৈপ্লবিক। উনিশ শতকীয় জাতীয়তাবাদের যথার্থ প্রতিনিধি। এরপরেই আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। সারা জীবন ধরেই কবিতার নিত্যনতুন আঙ্গিক নির্মাণের চেষ্টা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। '*মানসী*' কাব্যগ্রন্থে তিনি সরল কলাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তন করেন। *বলাকা*-র মুক্তক বন্ধের কথাও স্মরণীয়। প্রচলিত তিনরকম ছন্দকাঠামোর পাশাপাশি গদ্যছন্দ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নিরীক্ষা করেছেন। '*লিপিকা*'-তে গদ্যছন্দ নিয়ে যে নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল, *পুনশ্চ* পর্বে তা-ই পরিণতি পেল।

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত কয়েকজনের ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন অধ্যাপিকা অঙ্কনা বেতাল। বিস্তারিত বিশ্লেষণ নয় — এ যেন বাংলা কবিতার গত নব্বই বছরের চকিত ঝলকদর্শন। প্রেমেন্দ্র

মিত্রের কবিতায় বৈজ্ঞানিক চেতনার বহিঃপ্রকাশের কথা তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েও কাব্যভাষার অল্প অল্প পরিবর্তনের মাধ্যমে বাঁকবদলের পক্ষপাতী। তিরিশের দশকের কাব্যভাষার সংযমী পদক্ষেপ অনেকটাই বরং সাহসী হয়ে উঠল চল্লিশের দশকে এসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু হয়ে গেছে। দেশভাগ সমাগত। এই পরিস্থিতিতে কবিরাও অনেক বেশি রাজনৈতিক হয়ে উঠলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা এই ধারার বাহক। পঞ্চাশের দশকের কবিরা কিন্তু রাজনীতির বদলে অন্তর্মুখী কাব্যভাষার দিকে ঝুঁকলেন। চিৎকৃত প্রোপাগান্ডায় তাঁরা বিশ্বাসী নন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শব্দ নিয়ে নিরীক্ষা, অলোকরঞ্জনের দার্শনিক প্রাতিস্বিকতা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা তাঁদের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার। যৌথ যুগচেতনার বদলে ব্যক্তিগত মেধার নিরিখে পঞ্চাশের কবিদের চিনে নিতে হবে। ষাটের দশক একাধিক সাহিত্য আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে। হাংরি-শ্রুতি-শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলনের পথ পেরিয়ে তথাকথিত মুক্তির দশকের একজন কবি অন্তত সর্বসাধারণ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। জয় গোস্বামী, ভাস্কর চক্রবর্তী এবং দেবারতি মিত্রও এই সময়তেই লিখতে শুরু করেন। শহুরে মেটাফরের বহুল ব্যবহারের জন্য আশির দশক স্মরণীয়। সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুতপা সেনগুপ্ত, জয়দেব বসু। নব্বইয়ের দশকের পরবর্তী বাংলা কবিতা বিশ্বায়নোত্তর জীবনকে স্বীকার করে নিয়ে আরেক বাঁকবদলের সাক্ষী থাকল। আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তেই বক্তা উপনীত হন যে, বিশ শতকের দশকওয়ারি বিভাজন চলতি শতাব্দীর কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সাম্প্রতিক কবিতার নির্দিষ্ট কোনো অভিমুখ নেই। যে কবিতা আধুনিক জীবনকে সৎভাবে প্রকাশ করে, তা-ই আধুনিক কবিতা।

আলোচনাসভার দ্বিতীয় ভাগে ছিল প্রশ্নোত্তরপর্ব। শ্রোতাদের মধ্য থেকে উঠে এল টুকরো টুকরো প্রশ্ন। মিতায়তন এবং তীক্ষ্ণ। বক্তাও সহজ-লরল ভাষায় সংশয় নিরাকরণের চেষ্টা করলেন। প্রয়োজনবোধে স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করলেন দুয়েক পঙ্ক্তি কবিতা। আধুনিক কবিরা কি প্রকৃতি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন? সংশয় প্রকাশ করেছিলেন জনৈক ছাত্র। অধ্যাপিকা অঙ্কনা বেতাল ব্যাখ্যা করলেন, আধুনিক কবিরা চাঁদ-ফুল-পাখি-তারা নিয়ে কবিতা লিখতে পারবেন না — এরকম কোনো ফরমান নেই। শুধু আধুনিক হয়ে উঠতে গেলে চিরচেনা প্রকৃতিকেও নতুন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। যেমন, চর্যাগানে চাঁদের উপমান ব্যবহৃত হয়েছে : 'উদক চান্দ জিম সাচ ন মিচ্ছা'। এই বিশ্ব জলে বিম্বিত চাঁদের মতো — সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়। আবার বিশ শতকের বামপন্থী এক কবি সেই চাঁদকেই ঝলসানো রুটির উপমেয় হিসাবে ব্যবহার করলেন। একই বস্তু। কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যে দুটো কবিতা কত আলাদা হয়ে গেল! প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষ পর্যায়ে শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক জন অধ্যাপক স্মরণ করিয়ে দিলেন, গণিতের সঙ্গে কাব্যের মূলগত ঐক্য দুর্লক্ষ্য নয়। উভয়েই একটা পর্যায়ের পর বিমূর্তের দিকে এগিয়ে যায়। কেজো বক্তব্য প্রকাশের বদলে ক্রমশ ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে।

সবশেষে বাংলা বিভাগের প্রধান ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। সভার সময় ছিল এক ঘন্টা। কবিতায় আধুনিকতা সম্পর্কিত কিছু সংশয়ের উত্তর মিলল। কিছু নতুন দৃষ্টিকোণের সঙ্গে পরিচয় হল। আবার নতুন কিছু জিজ্ঞাসাও তৈরি হল। আরেকদিন ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিত আলোচনার ইচ্ছা জিইয়ে রেখেই এদিনের আলোচনায় যতি পড়ল।

Visit to Agri-Horticultural Society of India - New Alipore College Nature Club Event

Arko Sengupta
B.Sc., 2nd Year
Botany Honours

We visited to the AGRI-Horticultural Society of lndia to relish the Annual Flower Show on 10th February. 2018. It was the first event of our Nature Club. The experience of that flower show was asymptotic & fathomless for us. We're just flabbergasted after watching those several kinds of flowers, orchids, vegetables etc. The atmosphere inside the society was very attractive & also an ideal place to visit for NATURE lovers.

We, members of nature club, New Alipore College, foregathered at the main gate of Agri Horticultural Society of India at 8 am in the morning. We eagerly stepped into the annual flower show and the guidance of our professors helped us very much. We observed several kinds of colorful flowers, different types of colorful orchids & the aerial roots of the orchids. Then we observed several kinds of cactus and bonsai also. One of the attractive parts of that show was the daily life vegetables segment, there was several kinds of fresh vegetables, the sizes of those veggies were terribly huge and fleshy. It seemed like we consumed that particular few hours within a fraction of second with full of joy and satisfaction. It was a brilliant experience of ours in the debut of our nature club. We left that beautiful place with lots of memories and knowledge.

Later, a photography competition was organized by our New Alipore College Nature Club on 'Flowers of the Annual Flower Show at the Agri-Horticultural Society of India'. Judgment of this competition was done by open voting from the students & faculties inside the auditorium. I was ecstatic to receive the first prize at the competition in the presence of such august gathering.

Our New Alipore College Nature Club has just set off on a new journey and this initiative of New Alipore College is invaluable.

Our motto is to keep our nature safe and clean.

Report on 'One Week Research Methodology Workshop'

CMA Dr. Samyabrata Das
Associate Professor of Commerce & Coordinator, IQAC

A workshop on 'Research Methodology' was organised by the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of New Alipore College (with assistance from the Departments of Commerce, Economics and Mathematics of New Alipore College) in collaboration with the Department of Commerce, University of Calcutta held between 14th March 2018 and 20th March 2018 at New Alipore College.

The workshop opened with a formal Inaugural Session at 10.30 am on 14.03.2018. It continued from 10:30 am to 5.00 pm with a lunch break between 1.30 pm and 2.00 pm. The workshop was inaugurated by the gracious guest Dr. D.R. Dandapat, Dean, Commerce, Social Welfare and Business Management, University of Calcutta by lighting the lamp. Then he delivered the inaugural address. He explained the importance of this workshop for the research scholar and academic community. Prof. Dibes Bera, Teacher-in-Charge of New Alipore College delivered the welcome address. He appreciated the efforts of the team that organised the workshop. Dr. Samyabrata Das, Associate Professor of Commerce and Coordinator of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of New Alipore College highlighted the overview of the workshop with core aims, objectives, design and areas. Prof. Gorachand Nag, Associate Professor of Economics and Secretary of the Teachers' Council of New Alipore College offered a vote of thanks. Eminent resource persons from India and abroad shared their views during the workshop. The resource persons include Prof. Kumarjit Mandal (Associate Professor, Department of Economics, University of Calcutta), Prof J.K. Das (Professor of Statistics and Head of the Department of Commerce, University of Calcutta), Prof. Achintya Ray (Professor, Department of Economics, Tennessee State University, USA), Prof. Arup Kumar Chattopadhyay (Professor, Department of Economics, University of Burdwan), Prof. Gautam Banerjee (Associate Professor, NIT, Durgapur), Prof. Shankar Kumar Bhaumik (Professor, Department of Economics, Central University of South Bihar, Gaya), Prof. Panchanan Das (Professor, Department of Economics, University of Calcutta), Prof. Asis Kr. Chattopadhyay (Professor, Department of Statistics, University of Calcutta), Prof. Sharmistha Banerjee (Professor, Department of Business Management, University of Calcutta) and Prof. Ashish Kumar Sana, Professor, Department of Commerce, University of Calcutta). Topics of discussion include 'Introduction to Time Series Analysis', 'Research Methodology', 'Qualitative Data Analysis', 'Regression Analysis, Time Series and Forecasting',

‘Philosophy of Research’, ‘Testing of Hypothesis: Parametric and Non-parametric Tests’, ‘Basic Econometric Analysis on Estimation and Diagnostic Checking using Cross-Section Data’, ‘SPSS’, ‘Limited Dependent Variable Models: Theory and Applications’, ‘Panel Data Analysis’ etc. Prof. Gorachand Nag, Associate Professor of Economics and Secretary of the Teachers’ Council of New Alipore College delivered the valedictory address. The Certificates were presented to the participants by the esteemed dignitaries. The workshop was concluded with a vote of thanks proposed by Dr. Samyabrata Das, Associate Professor of Commerce and Coordinator of the Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of New Alipore College. The workshop was attended by forty participants. The programme was concluded with a happy note from everyone.

A Seminar Report on Citizenship and its Various Aspects

Department of Political Science

The Department of Political Science, New Alipore College hosted a discussion on Citizenship and its various aspects on 27th March 2018. Students of the department from various years, came together to be a part of it. Dr. Madhuparna Dutta (Assistant Professor, Department of Political Science, New Alipore College) introduced the theme of the seminar. She dwelled on the significance of the term citizen and citizenship. Renowned Professor Swadhin Kumar De (Retired Associate Professor, Maulana Abul Kalam Azad College, Kolkata) chaired and offered the audience with few interesting facets of the notion of citizenship. His delineation of good and bad citizens was indeed beguiling. The presentation by Prof (Dr,) Lipi Ghosh, (Professor, Centre for South and Southeast Asian Studies, Calcutta University) was primarily on the context of Citizenship in Indian society. She lucidly elucidated the Citizenship Act of 1955 and the diverse means of acquisition of Citizenship under the Act. The presentation further explored the new Amendment in the Citizenship Act in 2015 under the Modi government and how this Amendment facilitated the merger of Person of Indian Origin (PIO) and Overseas Citizenship of India (OCI) schemes, by which PIOs would also get life-long Indian visa. Prof.Bimal Shankar Nanda(President, West Bengal Political Science Association and Associate Professor, Charu Chandra College, Kolkata) made an illuminating discussion on the theoretical aspects of topic of the day. He highlighted three different classical conceptions of citizenship. The first is the liberal conception, which emphasises the equality of rights which each citizen holds, and how these rights enable the individual to pursue their aims and goals. The second theory, communitarianism. He argued that for communitarians, the individual does not exist prior to the community. A third theory of citizenship is the republican tradition. It accentuates participation in government as the foundation for the promotion of the civic good. Next he talked about one of the greatest theorist on Citizenship Thomas H Marshall who, he said, was originally an economic historian but moved to the sociology field around the 1950's. From here on, Marshall wrote many essays and literature including 'citizenship and social class' as well as creating the three strands of civil, political and social rights. The discussion on Citizenship became a lively one as the students, the departmental faculties, the chair and the presenters participated actively sharing and debating on various aspects of citizenship. Hence, the discussion titled 'Citizenship and its Various aspects' organized by the Department of Political Science, New Alipore College focussed not only on the people or human centric approach to the topic of discussion but also provided a theoretical exposition on the theme.

A Report on the Seminar 'Ultrafast spin dynamics' organised by Department of Physics

Prof. Kartik Adhikari
Assistant Professor
Department of Physics

This seminar was organized by Department of Physics of New Alipore College on, 6^{th} April 2018.

The principal purpose of the seminar was to introduce our college students with various modern research fields on magnetism to motivate our students. We invited Prof. Anjan Barman from S. N. Bose Centre, Kolkata, who is currently Senior Professor and Associate Dean (faculty) of Department of CMPMS of the same institute. Prof. Barman was felicitated by Physics Department at the presence of Vice Principal, TCS, various faculty members, staff members and students of our college. Prof. Barman delivered a nice presentation on very basics and various interesting research fields of magnetism as well as showed various research facilities available in his laboratory. There were very fruitful discussions between Prof. Barman and students. Our students were delighted after interacting with Prof. Barman. Lastly, Prof. Barman invited all students to make a visit to his laboratory as soon as possible.

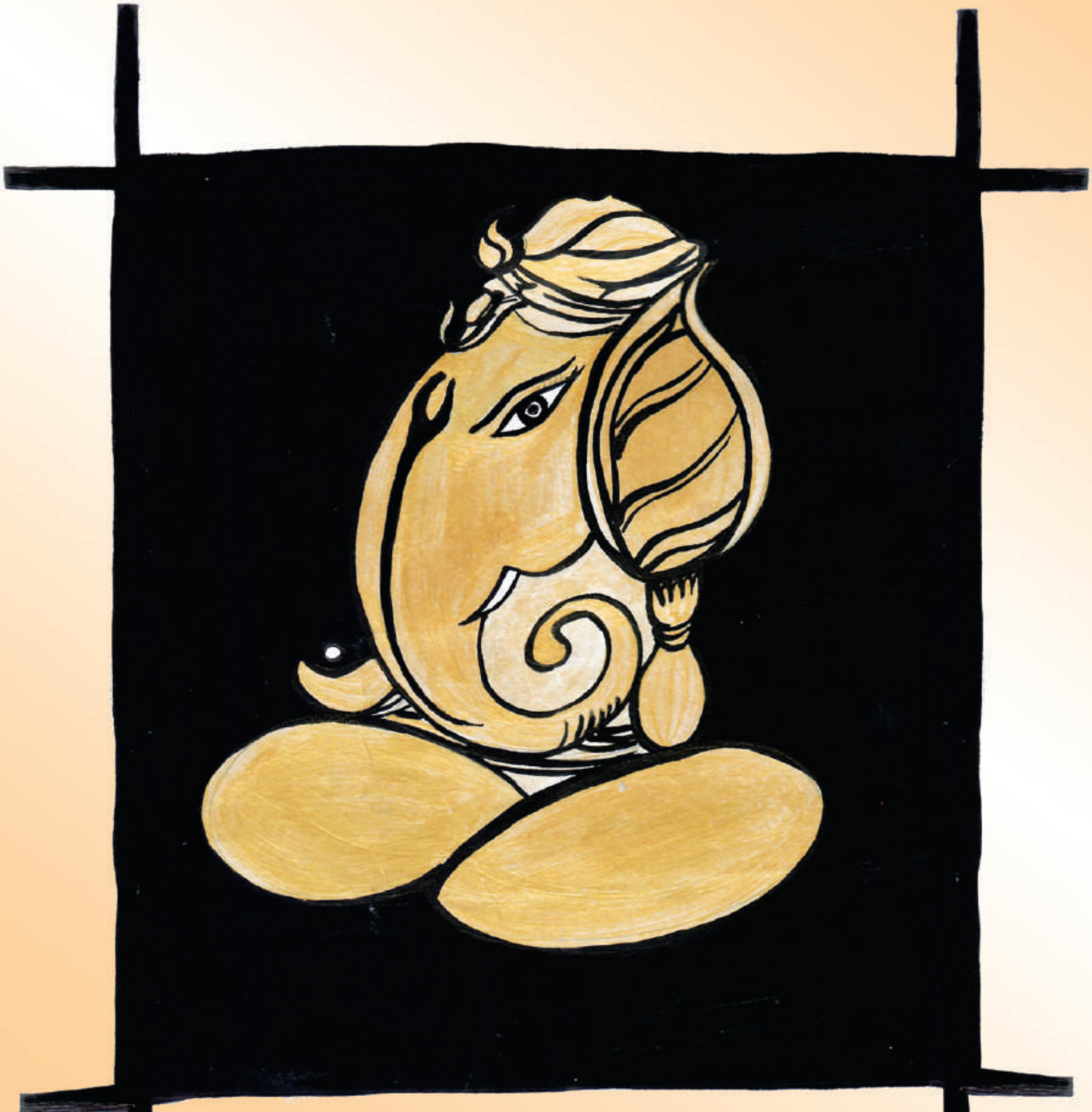

Sudeshna Sengupta
B.A., 2nd Year
English Honours

শ্রীশ্রী গণেশ-বন্দনা

সর্ব্ববিঘ্ননিহন্তারং সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতারং গণেশমনীশং ভজে।।

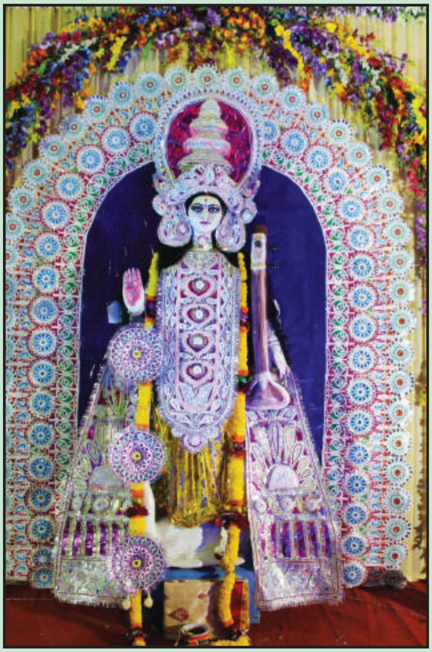

Saraswati Puja celebrations in college

Celebration of Republic Day in the college premises

Prof. Mala Sengupta
Dept. of Commerce

"দেবতাকে পূজা দিয়া তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মনোমত ইচ্ছাপূরণের উপায় শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলা অথবা ভারতবর্ষেই নহে, পাশ্চাত্য দেশের মানুষকেও বহুকাল হইতেই প্রভাবিত করিয়াছে।"

— সুকুমার সিংহ

Prize distribution ceremony

Prize distribution to underpriviliged children during NSS camp
organised by NSS Unit, New Alipore College

সায়নী ভুঁইয়া
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

"চিত্রকলা বাংলাদেশে চলিত ছিল দু-ভাবে; এক হল ঘরোয়া বা আটপৌরে শিল্প, আর এক হল পালাপার্বণের শিল্প যাকে পোশাকী শিল্প বলা যায়। বাংলা দেশের আটপৌরে ছবি তার পটের ছবি, আর তার পালাপার্বণের শিল্প দেবমূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি।"

— যামিনী রায়

Prize winning models displayed during science exhibition at Avensis 2017

Cultural programme by faculty during Avensis 2017

Preetam Biswas
B.Sc., 1st Year
Physics Honours

"মানুষের সমাজ পরিবর্তনশীল। এককালের সামাজিক পরিবেশ,
আচার-ব্যবহার নিয়মকানুন পরবর্তী কালে বদলাইয়া যায়।"
— অজিত কুমার ঘোষ
সায়নী ভুঁইয়া
কলা বিভাগ, প্রথম বর্ষ
বাংলা সাম্মানিক

Medical camp at Jhaldar Math by NSS Unit, New Alipore College

Rabindra Jayanti celebrations in college

Seminar organised by Department of Philosophy and Education

College cleaning activity by NCC Unit, New Alipore College

Drawing competition during Avensis 2017

Music workshop during Avensis 2017

Swarnadwip Bhattacharya
B.Sc., 3rd Year
Chemistry Honours

Debate competition during Avensis 2017

Drama competition during Avensis 2017

"শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাস-করা কোন সুরে।"
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Hena Roy
B.Sc., 2nd Year
Physics Honours

Indoor games

Workshop organised by IQAC

Cultural programme by non teaching staff during Avensis 2017

Prize distribution during Avensis 2017

COMMON PLANTS WITH MEDICINAL USES

Scientific name : *Catharanthus roseus*
Common name : Nayantara
Use: It is used to treat cancer, wasp stings and depression.

Scientific name : *Ocimum sanctum*
Common name : Tulsi
Use : It is used to treat diabetes, muscle pain, respiratory disorders, and allergies.

Scientific name : *Withania somnifera*
Common name : Aswagandha
Use: It has immunity-boosting, antioxidant, anti-stress properties.

Scientific name : *Hibiscus rosa sinensis*
Common name : China Rose
Use: It provides relief from high blood pressure and high cholesterol.

Scientific name : *Nelumbo nucifera*
Common name : Lotus/Padma
Use: It is beneficial to the spleen, kidney and heart.

Scientific name : *Andrographis paniculata*
Common name : Kalmegh
Use: It provides relief from flu and exhibits anti-HIV, antibacterial, antioxidant, antiparasitic properties.

Courtesy : Department of Botany

Hollyhock in full bloom in college garden

Published by New Alipore College | January 2019 | Printed by JPS Infomedia